"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্য মক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥"

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ; কিন্তু ঈর্ষার প্রভাবে মনুষ্য হৃদয়ে—ইহাদের একটিও স্থানপ্রাপ্ত হয় না, এবং

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।"

সর্ব্বভূতের প্রতি আত্মবৎ ভাব এই মহানীতির তত্ত্ব অর্থাৎ পরের সুখ-দুঃখাদির প্রতি মমত্ব এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানব-সাধারণের বন্ধনের ঐক্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য থাকে না; সুতরাং ঈর্ষা মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত করে, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হিংস্র জন্তু হইতেও হিংস্র করিয়া তোলে। ঈর্ষী পরের সর্ব্বনাশ চেষ্টা করিয়া পরের প্রাণে যেমন দারুণ আঘাত করে তেমনি নিজেও সে ক্ষণকালের জন্য সুখী হইতে পারে না। সর্ব্বদাই পরশ্রীকাতরের প্রাণ দুশ্চিন্তা-জড়িত, নিরানন্দ ও গভীর দুঃখান্বিত। তাহাকে নিরন্তর হৃদয়ে পাপ বৃশ্চিকের কঠোর দংশন সহ্য করিতে হয়। যাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর অনন্ত দুশ্চিন্তায় পর্য্যাকুল, তাহার কখন ও নিয়মিত ভোজন ও সুনিদ্রা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; শয়ন ভোজনের ব্যতিক্রম হইলেই বিবিধ শারীর-ব্যাধি সমুৎপন্ন হয়; তখনই শাস্ত্রের সেই মহাবাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—'তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ'। অন্য পাপের ফল কিছু কাল-বিলম্বে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঈর্ষার শোচনীয় পরিণাম তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। ঈর্ষা আমাদিগকে জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া নরকের গভীর গর্ত্তে নিক্ষেপ করে, দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মের অবশ্য-লভ্য ভগবৎ-প্রেম-ভক্তির অধিকার হইতে প্রচ্যুত করিয়া নৈরাশ্যের অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ করে; তাহার প্রভাবে এই সুদুর্ল্লভ মানব-জন্ম অর্থশূন্য হয়, সংসার মরুভূমি হয়, সর্ব্বপ্রকার সুখ শান্তির মূলোচ্ছেদ হয়। অজ্ঞানই ঈর্ষাদি রিপুকুলের খনি; সুতরাং ইহাদের বিনাশ-সাধনে জ্ঞানই আমাদের একমাত্র সহায়, অজ্ঞান-সমুত্থ দোষ-রাশির বিনাশে জ্ঞানই একমাত্র অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র; সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

"সর্ব্বমজ্ঞানজংপাপং ছিন্দ্যাদ্ জ্ঞানাসিনা বুধঃ।"

প্রাজ্ঞব্যক্তি জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা অজ্ঞানজ পাপরাশির উচ্ছেদ করিবেন। কিন্তু কেবল শাস্ত্রপ্রমাণ কণ্ঠস্থ করিয়া এবং মহাপুরুষদিগের সার-গর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়াই আমরা জ্ঞানী হইতে পারি না; তাহা জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান মাত্র। এই প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়াই আমরা আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করি, তজ্জন্যই আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন—

"চতুর্ভিশ্চ উপায়ৈর্ব্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি, আগমকালেন স্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহারকালেন চেতি।"

গুরুর নিকট হইতে গ্রহণকাল, নিজের অধ্যয়ন অর্থাৎ অভ্যাস কাল, অধ্যাপন বা অভ্যস্ত তত্ত্বের প্রকাশ কাল এবং ব্যবহার কাল অর্থাৎ জীবনের কার্য্যের সঙ্গে অধিগত তত্ত্বের সংমিশ্রণকাল, এই চারি প্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা হয়। এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা উপযুক্ত না হইলে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের প্রমাণ কণ্ঠস্থ করিলে, জ্ঞানের মহোপকারিত্বের সুন্দর মনোরম সহস্র

বর্ণনা পাঠ করিলেও অজ্ঞান ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করে না; কিন্তু পূজ্যপাদ পতঞ্জলি-কথিত পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ের প্রভাবে যখন মোহমেঘ উদ্‌ভেদ করিয়া হৃদয়াকাশে প্রদীপ্ত জ্ঞান-সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়, তখন ঘোর বিভীষিকাময় অজ্ঞানান্ধকার তস্করের ন্যায় দূরে পলায়ন করে—এবং পূর্ণসুখের সুবিমল বদনকান্তি মনুষ্যের নিকটে প্রতিভাত হয়।

আমাদের এমন শুভদিন কবে হইবে, কবে আমরা ঈর্ষার মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রেমসাগরে অবগাহন করিব? কবে আমরা প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকে অনন্ত প্রেমের সুমধুর গন্ধে অপার আনন্দ লাভ করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিব? কবে আমরা ঈশ্বরকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তির মালা উপহার দিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে সরল প্রাণে প্রফুল্ল বদনে বলিতে পারিব,—

হে দেব! দাসস্য গৃহাণ সর্ব্বং,
যত্তে প্রিয়ং কারয় মাং তদেব।
ত্বমেব শক্তির্গতিরাশ্রয়ো মে,
আস্তাং বিভো! ত্বাং প্রতি নিত্যযোগঃ॥

প্রার্থনা। (২)

নামে রুচি।

রাখিব তোমার নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া।
পরাণ পবিত্র হয় সে নাম গাহিয়া॥
তব নাম সম সুধা কিবা আছে আর?
হউক সে সুধা-সিক্ত হৃদয় আমার॥
অরূপ তোমার রূপ না পায় নয়ন।
কৃপা করি কিন্তু হৃদে দাও দরশন॥
হৃদি প্রেমচন্দ্র রূপে তুমি সুধাময়।
আত্মার সুহৃদ্‌ বন্ধু আশ্রয় অভয়॥
ভবের কাণ্ডারী ভব ভয়ের নাশন।
তুমি মুক্তি দাতা ভব-বন্ধন-মোচন॥
একান্তে যে লয় তব চরণ শরণ।
ভব-পারে তুমি তারে কর উত্তারণ॥
দয়া করি তুমি তারে দাও দিব্য জ্ঞান।
জীবনের অর্থ সেই করে প্রণিধান॥
পান্থশালা জেনে এই ভবের ভবন।
পরিজনে দেখে হয়ে বৈরাগ্য-নয়ন॥
অকর্ত্তা আপনা জানি কর্ত্তা তোমা করে।
তোমারই দাস হয়ে সংসারে বিচরে॥
করে সে তোমার কর্ম্ম হেথা প্রাণপণে।
যখন তাহারে ডাক অমৃত-ভবনে॥
মঙ্গল আদেশ তব জানি সুনিশ্চয়।
মরণ ত্যজিতে তার আনন্দ-হৃদয়॥
জানে সে সেখানে তার হইবে মঙ্গল।
আত্মার যে মলিনতা কাটিবে সকল॥
যথা নাহি রোগ শোক বিলাপ ক্রন্দন।
যোগানন্দে ব্রহ্মানন্দ হইবে মিলন॥
নূতন তোমার কার্য্য সেখানে সাধিবে।
প্রেমানন্দে তব নাম নিয়ত গাহিবে॥
তুমি হরি, পাপ হর, পতিত-পাবন।
মহাপাপী যদি পাপ করিয়া বর্জ্জন॥
পাপ জন্য অনুতাপি করিয়া ক্রন্দন।
কাতরে তোমার কাছে করিয়া গমন॥
বলে নাথ! "অধমেরে করহে উদ্ধার।
মোহ-বশে আর কভু ভুলিব না আর॥
তব পথ সুধাময় আমারে দেখাও।
চলিতে তাহাতে মোরে শুভমতি দাও॥"
কৃপা করি তুমি তারে বল কি বচন।
নিমেষেতে হয় তার নূতন জীবন॥
হয় ত তাহারে কর সাধু গরীয়ান্‌।
তব নাম প্রচারিতে কর আজ্ঞা দান॥
তার কথা শুনে কত তরে যায় লোক।
হয় সে জগৎ—পূজ্য, জগৎ—আলোক॥
চরম সম্বল তুমি, চিরন্তন ধন।
তুমিই আত্মারে সেথা করিবে পালন॥
যে তোমারে হৃদি ধামে এই থানে পায়।
পাইবে আশ্রয় তব নিশ্চয় সেথায়॥

প্রেম-অন্ন দিয়া তারে সেখানে তুষিবে।
কেবা জানে কত সুখ তুমি তারে দিবে॥
স্নেহময়ী মাতা তুমি—পিতা দয়াময়।
প্রেমের ভাণ্ডার হয় তোমার হৃদয়॥
দেখিতেছ আমাদিগে কত স্নেহ-ভরে।
দিতেছ কতই সুখ আমাদের তরে॥
সতত কতই বিঘ্ন করি নিরসন।
করিতেছ আমাদিগে রক্ষণ পালন॥
কত অপরাধ করি সংখ্যা নাহি তার।
কিন্তু করিতেছ ক্ষমা শত শত বার॥
অভাজনে কত দয়া করিছ বর্ষণ।
বুঝিতে না পারি তাহা কর কি কারণ॥
দেহের নিয়ম যাহা করেছ স্থাপন।
সুস্থ থাকে যেবা তাহা করিছে পালন॥
পাছে রোগে পড়ি করিতেছ সাবধান।
তোমার ইঙ্গিত বুঝে যেই প্রজ্ঞাবান্॥
রোগেতে ও তব দয়া বলি হারি যাই।
তোমারি ঔষধে বার বার প্রাণ পাই॥
পাপ-পথে যাহা হয় প্রথম স্খলন।
যাহা হ'তে ঘোরাবর্ত্তে দারুণ পতন॥
তাহা হ'তে তুমি রক্ষা কর হাত ধরি।
সখা হ'য়ে উপদেশ দাও দয়া করি॥
করিবে মলিন কায চিন্তা বিসর্জ্জন।
তোমার পথেতে নর করিবে গমন॥
তাই তারে শুভ মতি করিছ বিধান।
নাহি হবে ধূলি লয়ে হেথা ম্রিয়মাণ॥
তুমি চাও—হবে নর তোমার প্রেমিক।
জ্ঞান ধর্ম্ম সোপানেতে উঠিবে ক্রমিক॥
ভ্রাতায় ভ্রাতায় সবে প্রেমেতে মিলিবে।
তোমার মঙ্গল কার্য্য একান্তে সাধিবে॥
চলে যদি তব পথে মানব সকল।
এখনি স্বরগ হয় এ ধরা মণ্ডল॥
জীবনের আস্বাদন, তুমি রসায়ন।
এক মাত্র তুমি হও তৃপ্তির কারণ॥
আত্মার গভীর তৃপ্তি দেয় কি বিষয়?
আত্মা কাছে ধন মান—কিছুই না হয়॥
কিন্তু তুমি তৃপ্তি-খনি—তোমার স্মরণ।
অহরহ তোমা সঙ্গে জীবন যাপন।
অহরহ হৃদয়েতে তব সহবাস।
পূর্ণ করে আত্মার যা উচ্চ অভিলাষ॥
শান্তির আলয় তুমি হৃদয়ের নাথ।
কোটি কোটি জন্ম যদি থাকি তব সাথ॥
তথাপি তোমাকে আত্মা কেবলি চাহিবে।
তব প্রেম-সুধা তরে পিপাসু থাকিবে॥
প্রেমের সাগর তুমি নয়ন-অঞ্জন।
হৃদয়ের প্রিয়ধন দুঃখ নিবারণ॥
পরম সম্পদ তুমি পরম সহায়।
আত্মা যদি পায় তব সুশীতল ছায়॥
স্বরগের ভোগ তার এইখানে হয়।
ভব-রোগ তবে তার নাশে সমুদয়॥
তব নামামৃতে রুচি সবে তুমি দাও।
জপিতে সে নাম-সুধা সবারে শিখাও॥

দুর্গোৎসব।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এখন যেন এই মহাদেশ একরূপ নীরব নিঃস্তব্ধ। কএক দিনের উৎসাহ ও উদ্যম যেন কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। যা হৌক, এইটী বঙ্গদেশের হৃদয়োৎসব। এই উৎসবে মৃন্ময়ী দেবীমূর্ত্তিই উপাস্য। আমরা অবশ্য মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা দেখাইতে চাই এই মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তনায় ঋষিদিগের কি গূঢ় অভিসন্ধি ছিল এবং বর্ত্তমানে তাহা কতদূর ফলবৎ হইয়াছে। ঋষিরা ভাবিয়াছিলেন জ্ঞানমার্গ অনেকেরই পক্ষে দুরধিগম্য। তাহাতে প্রবেশ করা বড় কঠিন ব্যাপার। এই ভাবিয়া তাঁহারা অজ্ঞান লোকদিগের জন্য অমূর্ত্ত ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। সর্ব্বব্যাপককে একটা ব্যাপ্য ভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। তাঁহাদের

লক্ষ্য ছিল যে যাহারা সূক্ষ্মধ্যানে অসমর্থ তাহাদের জন্যই এই পূর্ব্বসোপান প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সেই সমস্ত কারুণিক-স্বভাব ঋষিরা বোধ হয় তৎকালে এইটুকু বিবেচনা করেন নাই যে, যে বস্তু অতি কঠোর সাধন-সাধ্য তাহাকে পাইবার জন্য কোনরূপ রাজকীয় পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে না। তাঁহারাই কহিয়াছেন, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কঠোর সাধনলভ্য পদার্থের জন্য অতি কঠোর পথ ব্যতীত অন্য কিছু সুগম পথ হইতে পারে না। এই পথে গমন অবশ্য কষ্টসাধ্য, কিন্তু তা বলিয়া কঠোরতার কড়াক্রান্তি বাদ দিলে চলে না। হও না তুমি অজ্ঞান, তা বলিয়া তুমি যে জ্ঞানলভ্য বস্তুকে জ্ঞান ছাড়িয়া যেন তেন প্রকারেণ লাভ করিবে ইহা হইতেই পারে না। ফলেও এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যদিও ঋষিরা অজ্ঞানের পক্ষে ইহা পূর্ব্বসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু অজ্ঞানেরা এই সোপানেই চিরকাল দাঁড়াইয়া আছে। উত্থান তো দেখিতে পাই না। কিন্তু ঋষিদিগের করুণার পরিসীমা নাই। তাঁহারা যদিও অজ্ঞানদিগের জন্য জ্ঞানবিরোধী একটা অন্ধ পথ খুলিয়া দিয়াছেন তথাচ তাহার ভিতরে একটু অস্ফুট আলোকও রাখিয়াছেন কিন্তু মূর্ত্তির বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ চাকচিক্যে মোহিত লোকেরা তাহা দেখে কৈ।

ব্রহ্ম জ্ঞানশক্তিসমন্বিত ও নিরাকার নির্ব্বিকার, ঋষিরা তাহা সম্যক জানিতেন। মূর্ত্তিপূজায় যে অমূর্ত্ত ব্রহ্মের প্রকৃত পূজা হয় না, সর্ব্বব্যাপক পদার্থে পরিচ্ছিন্ন ভাব অর্পণ করা যে জ্ঞানবিরোধী, ইহাও বেশ বুঝিতেন। বুঝিয়াও যে মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তনা করেন তাহার তাৎকালিক হেতু ছিল। অজ্ঞান জ্ঞানের নাশ্য। তাঁহারা অজ্ঞানের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মূর্ত্তিপূজার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে সেই অজ্ঞাননাশক জ্ঞানবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, বাহ্য মূর্ত্তির আকর্ষণ অধিক, প্রকৃত লক্ষ্য বস্তুকে তাহা বহুবিধ কল্পনা জল্পনা, কুহেলিকা এবং প্রহেলিকায় আচ্ছাদন করিয়া রাখে, সুতরাং অজ্ঞান মনুষ্য বাগুরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় চিরকালই এই মূর্ত্তিতেই আবদ্ধ থাকিবে। তাহার কোন কালেই আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে না। এই জন্য তাঁহারা এই মূর্ত্তিপূজার সহিত দেবীমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। ইহাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থখানি যেমন জ্ঞানাংশে তেমনি কাব্যাংশে আজও সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার প্রতিপাদ্য একটী আখ্যায়িকাচ্ছলে ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিরূপণ। আখ্যায়িকাটী এই। একজন মুমুক্ষু বৈশ্য ও একজন বিষয়লুব্ধ রাজা এক ঋষির নিকট গমন করেন এবং আপনাদিগের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কহেন এখন কি উপায়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তখন ঋষি উভয়কেই দেবীর আরাধনার উপদেশ দেন এবং প্রসঙ্গত তাঁহার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করেন। ফলত এই গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ। যাঁহারা বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা উহার মধ্যে কুত্রাপি মূর্ত্তিপূজার কোনই পোষকতা পাইবেন না। যিনি অর্চনীয়া তিনি শক্তিরূপিণী। ঐ গ্রন্থে যথায় তাঁহার উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে তথায় গ্রন্থকার মহর্ষি জগ-

তের শক্তিসমষ্টিই যে তাঁহার মূর্ত্তি ইহাই বলিয়াছেন। ফলত তাহা প্রকৃত পক্ষে হস্তপদাদি অবয়বের সজ্ঘাত নয়। উহা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির প্রতিকৃতি মাত্র। ব্রহ্মাদি দেবতার শরীরজ তেজ হইতে ঐ দেবীর উৎপত্তি। ইহার অর্থ আর কিছুই নয় সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে ঐ ব্যাপিকা শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। এই জন্য শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই আবির্ভূতা শক্তিকে গ্রন্থকার নারী রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

> অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
> একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥

ইহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতিপোষক। যাঁহার কোনরূপ লিঙ্গ নাই তাঁহাতে এইরূপ লিঙ্গ নির্দ্দেশ করিবার হেতু লোকের প্রতি ঋষিদিগের করুণা। অর্থাৎ সাধকেরা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে পিতা বা মাতা উভয় প্রকার ভাবেই ঈশ্বরকে ভাবিতে পারেন—ভাবা উচিতও।

প্রকৃত কথা এই যে, জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার ঐ শক্তির আয়ত্ত এই জন্য গুণত্রয় বা ব্রহ্মাদি হইতে উহাঁর মুখাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়া একটি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে বিশ্বব্যাপক প্রকৃতিতে যা কিছু কমনীয় এবং যা কিছু ভীষণতা আছে এই কল্পিত স্ত্রীমূর্ত্তিতে তাহা আরোপণ করিয়া ইহাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জগতের যত কিছু ভীম ও কান্ত ভাব দেখিতেছ তাহা এই শক্তিরই বিকাশ। গ্রন্থকার ঋষি দেবীমাহাত্ম্যে এইরূপে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির আবির্ভাব কীর্ত্তন করিয়া পরে অসুরসংহাররূপ রূপক আশ্রয় করিয়া কহিয়াছেন বিশ্বসৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল এই শক্তিপ্রভাবে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই শক্তি নিত্য মঙ্গলময়ী। অসুর নাশ অর্থাৎ অমঙ্গল দূর করিয়া দেবতার হর্ষোৎপাদন কিনা জগতে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা এই শক্তিযোগেই নিরন্তর সাধিত হইতেছে। দেবীমাহাত্ম্যে কথিত অসুরসংগ্রামের ইহাই প্রকৃত অর্থ। এই শক্তিরূপিণীর অর্চনা কর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। মুক্তি কামনা থাকে ইহাঁর অর্চনায় তাহা লাভ হয়। বিষয়বাসনা থাকে এই শক্তির সেবায় তাহার সিদ্ধি হয়। কিন্তু স্থূল ভোগ কামনা করা জ্ঞানের অনুমোদিত নয়। এইরূপে ঋষি গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। ইহার প্রথমাংশে অর্থাৎ যেখানে শক্তির আবির্ভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে সেখানে মূর্ত্তির কোনই কথা নাই কিন্তু উপসংহারে যথায় বৈশ্য ও রাজা নদীপুলিনে গিয়া আরাধনার্থ বসিলেন তথায় মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির কথা আছে। ঐ অংশটুকু যে পরবর্ত্তী কালের যোজনা সমগ্র গ্রন্থ আলোচনা করিলে তাহা সুস্পষ্ট বোধ হয়। কিন্তু যেরূপ গূঢ়ভাবে এবং কবিত্বের গর্ভে এই জ্ঞানবীজ নিহিত হইয়াছে তাহা স্থূলদর্শীর বড় একটা বোধগম্য হইবে না। সে সম্মুখে দেখিবে একটা স্থূল মূর্ত্তি এবং মাহাত্ম্য পাঠেও বুঝিবে তাহাই। এই দোষ নিরাকরণের জন্য পরবর্ত্তী ঋষিরা এই দেবীমাহাত্ম্যে দেবীসূক্ত নামে কএকটী ঋকমন্ত্র যোজনা করিয়া দিয়াছেন। নিয়ম এই যে, অগ্রে দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া পরে আদ্যোপান্ত দেবীমাহাত্ম্য পড়িতে হইবে। দেবীপ্রতিপাদক এই জন্য ইহার নাম দেবীসূক্ত। অগ্রে এই ঋকমন্ত্র পাঠ করিবার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে দেবীমাহাত্ম্য মধ্যে যদি কাহারও প্রকৃত একটা মূর্ত্তি ভ্রান্তি জন্মে ইহা দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ রূপে নিরাস হইবে। ফলত দেবীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম

একমেবাদ্বিতীয়ং। তাই শক্তিরূপিণী শুম্ভকে ক্রোধভরে কহিয়াছিলেন, একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। সুতরাং ইহা দ্বারা সাধককে বুঝিতে হইবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনাতেই মুক্তি। এবং তাহাই দেবীমাহাত্ম্যের প্রতিপাদ্য।

এখন কথা এই, শক্তি বলিতে একটা অন্ধশক্তি বা জড়শক্তি বুঝায়। জ্ঞানশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মের পূজা কেবল শক্তিপূজায় সম্ভবে না। সুতরাং জড়শক্তির উপাসনায় ফল কি। কিন্তু এই শক্তি যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা যে ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি দেবীসূক্তে তাহা অতিসুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঐ ঋক্‌মন্ত্রে একস্থলে আছে,অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী ইত্যাদি। এইটী শক্তির উক্তি। কথিত হইয়াছে অহং চিকিতুষী, স্বস্বরূপেণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতী। আমি স্বস্বরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়াছি। অর্থাৎ আমার স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরে কথিত হইয়াছে,

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি। অহং স্বয়মেব ইদং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু, ঈদৃক্‌স্বরূপিকা অহং যং যং কাময়ে ইত্যাদি।

ইহার অর্থ আমি স্বয়ংই এই ব্রহ্মাত্মক বস্তু, দেব মনুষ্য আমার সেবা করে। আমি যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়া থাকি। তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং সুমেধাম্। আমি স্রষ্টা ঋষিকে অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী এবং শোভন প্রজ্ঞাযুক্ত করি। সূক্তের এই সমস্ত প্রমাণে নির্ণীত হয় শক্তি ব্রহ্ম-নির্ব্বিশেষে দৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম না হইলে এই সমস্ত বাক্য কাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে। আরও, শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ এই প্রবচন অনুসারে শক্তি বলিতে শাস্ত্রানুসারে কেবল জড়শক্তি বুঝায় না তাহা ব্রহ্মাভেদে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বলিয়া বুঝিতে হয়। ঐ সূক্তের আর একটা স্থলে আছে অহং জনায় সমদং কৃণোমি। আমি লোকরক্ষার্থ সংগ্রাম করিয়া থাকি। অর্থাৎ বিশ্বে যা কিছু অমঙ্গল আমি তাহা দূর করি।

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোতি ইত্যাদি।

লোকের অসন দর্শন প্রার্থনাদি সমস্ত ক্রিয়া আমা দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ফলত দেবীমাহাত্ম্য এই দেবীসূক্তেরই প্রতিচ্ছায়া। এই সূক্তে কেবলই ব্রহ্মজ্ঞান, কুত্রাপি মূর্ত্তির কথা নাই। এই বেদবোধিত জ্ঞান কাব্যাকারে দেবীমাহাত্ম্যে রচিত হইয়াছে। কবির রচনা পাঠে অল্পবুদ্ধিদিগের যদিও মূর্ত্তিভ্রান্তি হয় দেবীসূক্ত পাঠে তাহার সম্পূর্ণ অপনোদন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য মাহাত্ম্য পাঠের পূর্ব্বে এই কএকটা বেদমন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে। এখন বেশ বুঝা গেল অমূর্ত্ত ব্রহ্মের যে মূর্ত্তি নাই ঋষিরা তাহা সুস্পষ্টই দেখাইয়াছেন এবং মূর্ত্তিপূজার বিরোধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। তোমার উপাস্য জ্ঞানশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম। অমন্তবো মান্ত উপক্ষীয়ন্তে, এই শক্তিরূপিণী কহিতেছেন আমাকে অন্তর্যামী রূপে না জানিলে মহাবিনাশ। প্রকৃত ব্রহ্মের উপাসনা কর নচেৎ তোমার মহাবিনাশ। মূর্ত্তিপূজায় সে মহাবিনাশ হইতে পরিত্রাণ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সারদীয় মহোৎসবে ঋষিদিগের এই গূঢ় অভিপ্রায় কিছু যে রক্ষিত হইতেছে তাহা বোধ হয় না। এখন অজ্ঞান ব্যক্তিরা কেবল নয়, কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-

রাও মৃৎপাষাণ মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপন না করিলে পূজা সফল জ্ঞান করেন না; মৃৎপাষাণ ছাড়িয়া ঋষিনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানপথের অনুবর্ত্তী হ'ন না। যখন দেখিতেছি মূর্ত্তিই জ্ঞানকে আবরণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন উহা এককালে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ফলত মূর্ত্তিপূজায় প্রকৃত আত্মোন্নতি হয় না। নিরন্তর জড়সেবায় আত্মা ক্রমশঃ জড়াকার ধারণ করে। সুতরাং মূর্ত্তিপূজায় মুক্তি সুদূরপরাহত। ব্রহ্মচর্য্য শমদমাদিসাধন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানময় ব্রহ্মে মনঃসমাধান ব্যতীত অন্তঃকরণশুদ্ধি ও মুক্তি হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কঠোর সাধনসাধ্য বস্তুর জন্য কঠোরতা চাই, তাহার একটু এ-দিক ও-দিক করিলে চলিবে না। শম দমাদি সাধনরূপ কঠোর ব্রতে অবস্থিত হও এবং দেবীমাহাত্ম্য ও দেবীসূক্তপ্রদর্শিত প্রকৃত গম্য-স্থানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর নিশ্চয়ই ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ তোমাতে ফলিত হইবে, তুমি কল্পিত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অর্চ্চনায় মনুষ্যত্ব পাইবে।

দুর্গোৎসবে কোন্ অংশ উপাদেয় এবং কোন্ অংশ ত্যজ্য আমরা এতক্ষণ তাহা বিবৃত করিলাম। যদিও জ্ঞানবিরোধি বলিয়া আমরা মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করি কিন্তু এই উৎসবে জনসমাজের যা কিছু মঙ্গল সাধিত হয় সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকি। বিজয়ার দিনে যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হন, অন্ততঃ ঐ এক দিনের জন্য যে অনেকে বদ্ধমূল শত্রুতাকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন ইহা নিশ্চয়ই দেবভাব। এতদ্ব্যতীত এই দুর্ভিক্ষের দিনে অনেকেই দীন দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছেন। অনেকেই দয়াপরতন্ত্র হইয়া কএকদিনের জন্যও যে অনেককে নানারূপে সুখী করিয়াছেন ইহা ভাবিলেও মনে অপার আনন্দোদ্রেক হয়। দয়াই ধর্ম্মপথের পরম সহায়। দয়া ব্যতীত ধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না। দুর্গোৎসবে অনেক স্থলেই যে দয়াবৃত্তির যথোচিত চরিতার্থতা সাধিত হয় তাহা নিঃসংশয়। আরও এই উৎসবের প্রভাবে দেশ মধ্যে শিল্প সাহিত্য বাণিজ্যাদি সুরক্ষিত হইতেছে ইহাও অস্বীকার করি না। কিন্তু যাঁহারা সমাজের অধিনায়ক, যাঁহাদের নেতৃত্বে এদেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে সেই সমস্ত শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানবান ব্রাহ্মণেরা যদি এই মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে, তাহার প্রকৃত প্রতিপাদ্য অমূর্ত্ত ব্রহ্মের উপাসনা সাধারণকে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ, নচেৎ জড়োপাসনায় ক্রমেই লোকের অধোগতি।

পত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কি প্রকার পদার্থ জ্ঞাত হইলে জীব জ্ঞানী হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ে বেদ বলিতেছেন পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্ত পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইলেই মনুষ্য যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে, অন্যথা নহে, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সকলের প্রকাশক, অবিদ্যা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানাদি হইতে যিনি পৃথক এমন পরমাত্মাকে আমি আপন ইষ্টদেব করিয়া জানি এবং সেই ইষ্টদেবকে জানিতে না পারিলে কেহই যথার্থ জ্ঞানবান হইতে পারেন না। সেই পরমাত্মাকে উপাসনা দ্বারা জানিয়াই সাধু

মহাত্মা ও আপ্ত পুরুষেরা সকলপ্রকার ক্লেশ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত হন। এই উপাসনা ব্যতীত সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির অন্য উপায় বা পথ নাই। সেই পরমাত্মাকে অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা অথবা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থ ধারণ শক্তি দ্বারা কিম্বা বহু শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। আত্মদর্শনার্থ যে সাধক "যমেব" সেই পরমাত্মায় মন বচন ও কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া (বৃণুতে) তাঁহার স্তুতি প্রার্থনা, বিচার ও ধ্যান করেন (তেন লভ্যঃ) তিনিই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়েন; এবং তাঁহার নিকটেই পরমাত্মা স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন। বলিতে কি কঠোপনিষদের এই একমন্ত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের তৃতীয় বীজের সত্যতার জাজ্জল্যমান প্রমাণ।

মুমুক্ষু ব্যক্তি অর্থাৎ মুক্তিপ্রার্থনাকারী ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিতেছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সাধুসঙ্গ, নির্ম্মমতা ও ঈশ্বরভক্তি বা ঈশ্বরোপাসনায় সদা নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য।

পরমযোগী পতঞ্জলি ঋষি বলেন যে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতি বিশিষ্ট রূপ ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা তল্লাভের সুগম উপায়। এমন কি কেবলমাত্র উপায়। অর্থাৎ অপর যে সকল উপায় আছে তাহা এই উপায়ের অঙ্গ মাত্র। পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা জীবের সমাধি লাভ হয়। পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি পরম প্রীতি ও ভক্তি উচ্ছ্লিত করাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। সকল কার্য্যেই সাধক কায়মনোবাক্যে আপনাকে ঈশ্বরাধীন মনে করিবেন। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন তৎফলের প্রতি অনুসন্ধান বা দৃক্পাৎ না করিয়া সেই পরমগুরু পরমাত্মাকে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্ত জ্ঞানানুকূল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ও অকপট ও পুলকিত চিত্তে সর্ব্বদাই তাঁহারই ধ্যান ও চিন্তনে মগ্ন থাকিবেন। যখন যোগীর মন ঈশ্বর ছাড়া অপর কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হয় তখনই যোগী পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মায় বিরাজ করেন। ঈশ্বরোপাসনাই যে একমাত্র ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। দেখুন আমাদিগের মন অবিদ্যাবশতই চারিদিকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের জন্য লালায়িত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যখন আমরা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ পরমাত্মার সন্নিকটস্থ হই, যখন আমরা সকলের আধার স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হই তখন আর আমাদিগের মন কোন বাহ্য পদার্থের জন্য উদ্বিগ্ন হয় না। এই জন্যই যোগ দর্শনে লিখিত আছে "বিশেষদর্শিনি আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ"। অর্থাৎ যোগী যখন সমাধি প্রভাবে বিশেষ দর্শনে সমর্থ হন অর্থাৎ যখন অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের ও পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হন তখন আর তাহার কোন বাহ্য বিষয় জানিবার বা প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না এবং ইচ্ছা না থাকিলেই ভাবনা নিবৃত্তি হইয়া চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এবং চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলেই চিত্ত যে বাহিরের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইত তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়া অন্তরতম পরমাত্মায় মগ্ন হয়।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৫৮৪৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৩১৶০
সমষ্টি	...	৩২১৫।৵০
ব্যয়	..	৪৪৮৵৯
স্থিত	...	২৭৬৭৶৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲	
দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	২০০০৲	
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৵৩	
	২১৩৮৵৩	
		২৬৩৮৵৩
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু		৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত		১২২৴০
		২৭৬৭৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	... ২৩৩৮৵৩

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১৩৮৵৩
	২৩৩৮৵৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৭।০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	কলিকাতা	১২৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন,	ঐ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ ঘোষ,	ঐ	২।০
" " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
" " বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
" " বিপিনবিহারী সরকার,	ঐ	৩৲
" " মথুরানাথ রায়,	ঐ	৩৲
		২৭।০
পুস্তকালয়	...	১৩।৴০
যন্ত্রালয়	... ...	১৯৯৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২॥০
কমিশন	... ...	৩৶৯
সমষ্টি		২৫৮৪৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৯৬॥৴৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪৸৶০
পুস্তকালয়	...	২০৸৵৯
যন্ত্রালয়	...	৯৫৸৵৬
গচ্ছিত	...	৯৸৯
সমষ্টি	...	৪৪৮৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫১ সংখ্যা　　　　১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৯ শক। ২৭ এ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

সংসার মরীচিকা।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরুভূমি ধূধূ করিতেছে, উপরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড খরতর তাপ বর্ষণ করিতেছে। পথিক তাহার মধ্য দিয়া চলিতেছেন। তাঁহার মুখে চোখে নাসিকায় উত্তপ্ত বালুকা বায়ুযোগে আসিয়া লাগিতেছে। তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত। সঙ্গে যাহা কিছু জল সম্বল ছিল তাহা ফুরাইল। অবশিষ্ট কর্দ্দমাক্ত জল-বিন্দুও চুষিয়া লইলেন। এক ঘটি স্বর্ণের বিনিময়ে এক ঘটি জলও সুলভ বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। জলের জন্য যত ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার যন্ত্রণার অবধি রহিল না। এমন সময় সম্মুখে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক হ্রদ দেখিয়া তাঁহার আশার সঞ্চার হইল। এদিকে জললাভের জন্য যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হ্রদ তত পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল, পথিক পরিশেষে বুঝিলেন, এ হ্রদ নয়—মরীচিকা! সকলি ভ্রম। তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, এ সংসার এই মরীচিকারই প্রতিরূপ। আর একরূপ মরীচিকা সমুদ্রে ও আকাশে সময়ে সময়ে দেখা গিয়া থাকে। অনেকে দেখিয়াছেন, আকাশপ্রান্তে পুরাতন সহর, বৃহৎ দুর্গ, গির্জ্জার চূড়া প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর প্রকাণ্ড পদার্থ সকল, শ্রেণী বন্ধন পূর্ব্বক সজ্জীভূত রহিয়াছে। আবার দেখিতে দেখিতে তাহাদের রূপান্তর ও স্থানান্তর ঘটিল। যেখানে দুর্গ সেখানে সেতু; যেখানে সেতু সেখানে উচ্চ পর্ব্বতচূড়া। পণ্ডিতেরা এই প্রকার মরীচিকার সহিত মনুষ্যের সুখ সৌভাগ্যের তুলনা করিয়া থাকেন। স্ত্রী বল, পুত্র বল, ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল, প্রভুত্ব বল, সৌন্দর্য্য বল, সকলই অবস্থান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। ইহারা কখন সুখপ্রদ কখন দুঃখদায়ক। ইহারা এই আছে এই নাই। এই সব লইয়াই আমাদের সংসার। একে এই সংসার, প্রকৃতির অত্যাচার ও দৈব দুর্বিপাকে প্রপীড়িত, তার উপর মনুষ্য কেন পরস্পর শত্রুতা করিয়া পৃথিবীর মলিন

মুখকে আরো মলিন করিয়া তুলে? একে উপর হইতে ঝড়, তার উপর নিম্নে পরস্পর রক্তারক্তি! কেন মনুষ্য আপনার শক্তিকেই সর্ব্বস্ব মনে করে? কেন সৌভাগ্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পরপীড়নে প্রবৃত্ত হয়? অন্য লোকের কথা আর কি বলিব, সেই প্রথম নেপোলিয়ন্ যিনি সমগ্র পৃথিবীকে একাকী ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, তাঁরই অবস্থা আলোচনা কর। তিনি সাক্ষাৎ অগ্নি স্বরূপ ছিলেন। পৃথিবী তাঁর নামে থর থর কাঁপিত। কি তাঁর সাহস, কি তাঁর রণনৈপুণ্য,—কি তাঁর সৌভাগ্যের প্রভাব! আরকোলার যুদ্ধে যখন চতুর্দ্দিক হইতে কামানের অগ্নিময় গোলা ছুটিতেছে, তখন তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণ তাঁহাকে নিবেদন করিল, মহারাজ! করেন কি? একটু সাবধান হউন। তিনি বলিলেন, জান না, আমি সৌভাগ্যের প্রিয় পুত্র, যে গোলা আমায় মারিবে, তাহা আজিও ছাঁচে ঢালা হয় নাই! যে দিন য়ুরোপের সমস্ত রাজগণ পারি রাজধানীতে উপস্থিত, যে দিন তোপ ধ্বনিতে কর্ণপাত করা ভার—যে দিন প্রকৃতিপুঞ্জ নেপোলিয়নের জয়ধ্বনিতে রাজধানীকে সমুদ্র-গর্জ্জনবৎ ঘোর রবে পরিপূরিত করিতেছে—যে দিন তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন, সে দিন তাঁহার পক্ষে কি মহোল্লাসের দিন! পোপ স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত। তিনি যখন রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে পরাইতে যাইতেছিলেন, তখন নেপোলিয়ন ঐ মুকুট তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া স্বহস্তে আপনার মস্তকে সংলগ্ন করিলেন। ভাবিলেন, নিজ শক্তিতে রাজ্যলাভ হইয়াছে, নিজ হস্তে মুকুট কেন না পরিধান করিবেন? তিনি সৌভাগ্য সময়ে ঈশ্বরের শক্তি—ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে কোথায় সে সৌভাগ্য-দর্প রহিল! রাজরাজেশ্বর বন্দী! সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দী! কোথায় বৃহদায়তন রাজ্য—কোথায় পুত্র পরিজন, কোথায় স্বর্ণসিংহাসন, কোথায় কোটি কোটি সুশিক্ষিত সৈন্য—নিমেষ মাত্রেই সকলি বিলয় প্রাপ্ত হইল! প্রবল জ্বরে ভগ্ন হৃদয়ে নির্জ্জন দ্বীপে সেই পূর্ব্বের পরিত্যক্ত সাধ্বী স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপিত করিয়া যুদ্ধের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এ সংসারে বাদসাহী এইরূপ!

লিডিয়ার রাজা ক্রিসস্ এক সময়ে মহাজ্ঞানী সোলনকে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া সগর্ব্বে কহিলেন "এমন নিখুত সুখ কার আছে"। তাহাতে পণ্ডিতবর উত্তর করিলেন, মহারাজ! শেষ দিন পর্য্যন্ত দেখিয়া ও কথা বলিবেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ কথা শোভা পায় না। ফলেও তাহাই ঘটিল। এক সময়ে পারস্যাধিপতি, মহারাজ ক্রিসস্‌কে যুদ্ধে জয় করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। পরে আদেশ করিলেন ইহাঁকে চিতানলে ভস্মীভূত কর। বন্দীকৃত রাজা ক্রিসস্ তৎশ্রবণে কাতর প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, সোলন্! সোলন্! সোলন্! ইহাতে পারস্যাধিপতি বিস্মিত হইয়া ক্রিসস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বলিতেছ'। ক্রিসস্ উত্তর করিলেন, আমিও এক সময়ে আপনার ন্যায় সৌভাগ্যবান রাজা ছিলাম। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য মহাজ্ঞানী সোলন্‌কে একদা দেখাইয়া কহিয়াছিলাম, "দেখ আমার মত সুখী ভূমণ্ডলে আর কে আছে? এমন নিখুত সুখ কার ভোগ হয়? তাহাতে তিনি আমার শিক্ষার

জন্য বলিয়াছিলেন, 'শেষ অবধি না দেখিয়া অমন কথা বলিও না'। আজি সে কথা যথা সময়ে মনে পড়িয়া গেল। তাই সোলন্! সোলন্! সোলন্! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ইহাতে পারস্যাধিপতির চৈতন্য হইল। তিনি ক্রিসস্‌কে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কহিলেন সৌভাগ্যগর্ব্বে আর কখন গর্ব্বিত হইব না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যখন অর্জ্জুন কুলস্ত্রী সমভিব্যাহারে দ্বারকা হইতে হস্তিনা আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে তাঁহারা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। দস্যুরা অনায়াসে অনেক কুলস্ত্রীদিগকে তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল। পরে তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্ এই আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করিয়াছি, তবে কেন পথি মধ্যে সামান্য দস্যুদিগকে আঁটিতে পারিলাম না। তাহাতে কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, শক্তি কি তোমার? ভগবান তোমার শক্তি যতক্ষণ দিয়াছিলেন, ততক্ষণ তুমি জয়ী হইয়াছিলে। এখন তাঁর শক্তি তিনি প্রত্যাহরণ করিয়াছেন। তখন অর্জ্জুনের শিক্ষা হইল।

ইহাতেই বুঝিতে হইবে মানুষের আর বল কোথায়? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্য, তার আবার বল কি! সকল শক্তি সকল বল তাঁর। জানি না তবে মনুষ্য কেন আপন বলের অহঙ্কার করে? কেন আপনার সৌভাগ্যে স্ফীত হইয়া দুর্ব্বলকে পীড়ন করে? ফুলের বাগানে গোলাপের ন্যায় মনুষ্য আহ্লাদে প্রস্ফুটিত হইয়াছে দেখিয়া কেন তার প্রতিবেশী সুখী হয় না? কৃষক বহু পরিশ্রম করিয়া তাহার ক্ষেত্রকে শস্য ও শোভার আধার করে। তবে শস্যশালী ক্ষেত্র হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য-পরিবারকে আমরা কেন না যত্নের সহিত আহ্লাদিত করিতে চেষ্টা করিব? যদি সুন্দর ফুলের বাগান দেখিলে মনে আহ্লাদ হয়, তবে প্রফুল্ল মানবকুল দেখিলে কেন না আমরা আহ্লাদিত হইব? মহাকবি সেক্‌সপিয়র বলিয়াছেন, ভালবাসাই স্বর্গ। সে স্বর্গ-সুখে কেন আমরা বঞ্চিত হইব? আমাদের অভিমান আছে—আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী আমরা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। কিন্তু কেবল মতে নিরাকার ব্রহ্মবাদী হইলে কি ফলোদয়? আমরা কি ভগবানের দয়া ও প্রেমরূপে সমাধি করিতে শিক্ষা করিব না? সেই ভালবাসা কি মনুষ্যের মধ্যে বিলাইতে পারিব না? যদি না পারি তবে সবই নিষ্ফল। এ সংসারে সবই অসার; কেবল দয়া ও প্রেমই সত্য ও সকল সুখের মূল। এ অনিত্য সংসারে যিনি জীবে দয়া ও ঈশ্বরে প্রেম করেন, তিনিই মনুষ্য, তাঁরই জন্ম সার্থক।

কোথায় করুণাময়ী! এ সংসার যে ক্ষণভঙ্গুর তাহা তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দেও। সকল শক্তি যে তোমার তাহা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ কর। কোথা মা আনন্দময়ী! আমরা আজি তোমার দুঃখী সন্তান সকলে তোমার অমৃতকর শান্তিময় ক্রোড়ে আসিয়াছি, আর সংসার-যন্ত্রণা সহ্য হয় না, দেখা দেও—দেখা দেও। তোমার স্থির বিমলানন্দে হৃদয়কে পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তভাষ্য—ব্রহ্মসূত্র।*

বাদরায়ণপ্রণীত ব্রহ্মসূত্র এক সময়ে সমধিক মান্য গণ্য ও প্রমাণ গ্রন্থ বলিয়া লোকের স্থির বিশ্বাসে আরূঢ় ছিল। সেই কারণে তৎপরবর্ত্তী কালে যিনি যখন সাধকসম্প্রদায়ের আচার্য্য বা গুরু হইয়াছেন তাঁহাকে তখন বাধ্য হইয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা লিখিতে হইয়াছে। স্বপ্রচারিত মত ব্রহ্মসূত্রবিরুদ্ধ হইলে লোকে পাছে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করে, শিষ্যগণ পাছে গ্রহণ না করে, সেই ভয়ে অথবা ব্রহ্মসূত্রানুযায়ী হইলে লোকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিবে, সেই প্রত্যাশায়, প্রত্যেক আচার্য্য স্ব স্ব মতের অনুকূলে ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, রাজা রামমোহন রায় মহানুভাবকেও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের খুব প্রাচীন ব্যাখ্যা এখন আর পাওয়া যায় না। শাঙ্কর ভাষ্য, রামানুজ ভাষ্য, মধ্ব ভাষ্য, বল্লভ ভাষ্য, নিম্বার্ক ভাষ্য, শৈব ভাষ্য, বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ ভাষ্য, এই সপ্ত ভাষ্য পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, বিষ্ণুস্বামীর ও জনৈক শাক্ত আচার্য্যেরও ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য ব্যাখ্যা আছে।

একই ব্রহ্মসূত্র, কি প্রকারে বিভিন্ন মতের অনুকূলে বা পোষকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য অনেক সময়ে অনেকের মনে কৌতুকোদয় হইতে দেখা যায়। পরন্তু সে কৌতুক সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের পঠন পাঠনার অল্পতা, পুস্তকের অপ্রাপ্তি, তত্তৎ পুস্তকীয় ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা, ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে চরিতার্থ বা বিনিবৃত্ত হয় না। তাই তাঁহারা বলেন, যদি এমন একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় যে, যাহাতে উপরে সূত্র এবং তন্নিম্নে পর পর প্রত্যেক আচার্য্যের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সংকলন বিন্যস্ত থাকে, তাহা হইতে বোধ হয় উক্ত কৌতুক কথঞ্চিৎ বিনিবৃত্ত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সকল মতের তরতম ভাবও বুদ্ধিস্থ করা যাইতে পারে। পুস্তকখানি যেরূপ হওয়া উচিত তাহার নিদর্শন স্বরূপ ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম সূত্রটী যথাযথ সজ্জীকৃত করিয়া পত্রিকাস্থ করিলাম। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম সূত্র—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১

প্রথম শঙ্কর মতে অক্ষরার্থ যোজনা।

'অথ' অনন্তর। 'অতঃ' এতৎকারণে। 'ব্রহ্ম' বক্ষ্যমাণ-লক্ষণ পরমাত্মা। 'জিজ্ঞাসা' জানিবার ইচ্ছা। 'করিবেক' এইরূপ একটী পদ উহ্য।

অনন্তর অর্থাৎ পরে। কাহার বা কিসের পরে? সূত্রে সে কথা না থাকায় আচার্য্যগণ সকলেই স্ব স্ব অভিপ্রেত কথা বলিবার সুবিধা পাইয়াছেন। শঙ্কর বলেন, সাধন-চতুষ্টয়-যুক্ত হওয়ার পরে। নিত্যানিত্য বিবেক, ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বৈরাগ্য, শমাদিষট্‌ক অভ্যাস, (শম-দম উপরম সহিষ্ণুত্ব কর্ম্মান্তর বর্জ্জন ও মনঃস্থৈর্য্য, এই ছয়) এবং মোক্ষেচ্ছা। এই চার প্রকার পুরুষগুণের নাম সাধন-চতুষ্টয়। শঙ্কর যুক্তি দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন মনুষ্যই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, অন্যে নহে। অর্থাৎ

* এই প্রস্তাবটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যেরা একই সূত্র অবলম্বন করিয়া যুক্তিবলে একই বেদ-বাক্য হইতে কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এবং তাৎপর্য্য টানিয়া বাহির করিয়াছেন তদ্বিষয়ে পাঠকের অভিজ্ঞতা-চক্ষু ফুটাইয়া দিবার জন্য আমরা ইহা মুদ্রিত করিলাম। সং।

যে ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম তাহারই অন্তরে প্রতিভাত হন, অন্যের নহে। যাহারা কৌতুকাদি বশতঃ ব্রহ্ম-বিচারে প্রবৃত্ত, তাহাদের ব্রহ্মদর্শন দুর্লভ। সুতরাং সিদ্ধান্ত—সূত্রোক্ত অথ শব্দের অর্থ সাধনচতুষ্টয়সিদ্ধির অনন্তর।

অতঃশব্দের অর্থ—'এই হেতু'। এখানেও "কি হেতু?" তাহার উল্লেখ নাই। শঙ্কর বলেন, সূত্রস্থ হেতুবাচী "অতঃ" শব্দের অর্থ—যে কারণে লোকের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হওয়া সুসম্ভব, সেই কারণ উক্ত অতঃ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। বিবরণ এই যে, লৌকিক কৃষ্যাদি কর্ম্মের ফল ক্ষণধ্বংসী, এবং বৈদিক যাগ দান হোমাদির ফলও তদ্রূপ, পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অতদ্রূপ অর্থাৎ অনশ্বর বা অক্ষয়; সেহেতু অতঃ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত যে "যেহেতু বেদ যুক্তি সহকারে দেখাইয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অসীম ও অক্ষয়, আর সব সসীম ও ক্ষয়শীল, সেই হেতু সংসার-দুঃখাতুর মানব ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হইবেক।

ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা কাহাকে বুঝিব? এ স্থানেও মতভেদ দেখা যায়। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম কি, ব্রহ্ম শব্দে যাহাকে বুঝিতে হইবে, তাহা সূত্রকার স্বয়ং পরসূত্রে বলিয়াছেন। এবং ব্রহ্মশব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়ানুযায়ী অর্থের দ্বারাও ব্রহ্ম কি তাহা বুঝা যায়। যথা—শ্রুতিতে এবং শ্রুত্যনুযায়ী শাস্ত্রান্তরে "ব্রহ্ম" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ঐ প্রয়োগ নিরর্থক, এ কথা বলা যায় না। কাযেই স্থির হয়, উহার প্রতিপাদ্য বা অর্থ আছে। পরে ব্যাকরণাদির দ্বারা জানা যায়, ঐ শব্দ কোন অসীম মহৎ বস্তুর বাচক। বৃহ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি অর্থাৎ বড়। সঙ্গে সংকোচক শব্দ না থাকায় এবং অনন্ত শব্দের উল্লেখ থাকায় পরিস্কার বুঝা যায়, ব্রহ্ম দেশকালাদিপরিচ্ছেদ-শূন্য সুতরাং নির্দোষ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অসীম মহদ্বস্তু।

জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ জানিবার ইচ্ছা। জানা ও ইচ্ছা দুইটীর কোনওটীর সহিত "করিবেক" কথার সাঙ্গত্য ঘটে না। কোন প্রকার কার্য্যের অর্থাৎ কৃতি-সাধ্য পদার্থের সঙ্গেই "করিবেক" কথা সঙ্গত, পদার্থান্তরের সহিত নহে। জ্ঞান বস্তুর অধীন, সেজন্য তাহা ইচ্ছার দ্বারা করা যায় না। ঘটবস্তু যদ্রূপ জ্ঞানও তদ্রূপ হয়, ইচ্ছা তাহাতে পট-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। অতএব, জিজ্ঞাসা শব্দান্তর্গত জ্ঞান ফলীভূত জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) এবং সন্‌প্রত্যয় বাচ্য ইচ্ছা শব্দের অর্থ তৎসাধ্য বিচার।

সমুদায় কথার মিলিতার্থ,—আগে সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া অধিকারী হইবেক, পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ তদ্বোধক বেদান্তবাক্য অবলম্বনে মীমাংসা বা বিচার করিবেক। চিত্ত, বিচারের দ্বারা সুসংস্কৃত হইলেই তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হইবে।

অধিকরণ।

ব্রহ্মসূত্রের অন্য নাম উত্তরমীমাংসা। উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগের (উপনিষদ ভাগের) বিচার। এতৎ শাস্ত্রে বিচারের অন্য নাম অধিকরণ—তাহা পঞ্চাবয়ব। অর্থাৎ প্রথমে বিচার্য্য বাক্যের উল্লেখ, পরে তাহাতে সংশয়, তৎপরে পূর্ব্বপক্ষ, তৎপরে সিদ্ধান্ত। এই চারি অবয়ব প্রধান, এবং তৎসঙ্গে সংগতি নামক

অবয়ব থাকাও আবশ্যক। সংগতি অর্থাৎ বিচারের সহিত অধ্যয়নাদির সম্বন্ধ প্রদর্শন। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রটীও উপরি উক্ত পঞ্চাবয়ব বিচারের সূচনায় গ্রথিত। সুতরাং প্রথমাধিকরণের নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণ। শঙ্কর এই অধিকরণ চারি প্রকার বর্ণকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিষয় সংশয়াদি উল্লেখ করিয়া যে সেই সেই বিষয়ের মীমাংসা করা হয়, তাহারই অন্য নাম বর্ণক।

প্রথম বর্ণক।

বিষয়—ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যের বিচার।

সংশয়—তাহা আরম্ভনীয় কি না। সংশয়ের মূল বা বীজ এই যে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের অর্থ—ব্রহ্মই জীব। পরন্তু তাহা সম্ভব? কি অসম্ভব? সম্ভব হইলে বিচার্য্য বটে, অসম্ভব হইলে অবিচার্য্য। অপিচ, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি বেদান্ত বাক্যের অর্থ—ব্রহ্মাত্মজ্ঞ ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও শোকোত্তীর্ণ হয়। ইহারও সম্ভব অসম্ভব দ্রষ্টব্য। সম্ভব হইলে আরম্ভনীয়, অসম্ভব হইলে অনারম্ভনীয়।

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মই জীব, এবং আত্মাই ব্রহ্ম, এ অর্থ ভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তবিচারজনিত জ্ঞানে সুখ দুঃখ জন্মমরণাদি প্রবাহরূপ সংসারের উচ্ছেদরূপ মুক্তি হয়, এ অর্থও প্রত্যক্ষবাধিত ও অসম্ভব। আমি ব্রহ্ম নহি, এ অনুভব (প্রত্যক্ষ) সার্ব্বজনীন এবং শত শত লোকে বেদান্ত বিচার করিতেছে অথচ কাহার উক্ত প্রকার মোক্ষ হইতে দেখা যায় না।

সিদ্ধান্ত—অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের প্রচ্ছাদনে ও অধ্যাসে আমি ব্রহ্ম নহি, আমি জীব, এতদ্রূপ ভ্রান্তমনোবৃত্তির (প্রত্যয়) উত্থান সুসম্ভব এবং সুখ দুঃখ জন্ম মরণাদিপ্রবাহরূপ সংসারের ভ্রান্তিমূলকতা বিষয়ে অভ্রান্ত জ্ঞানের উদয়ে তিরোভূত হওয়া সুসম্ভব। যেমন রজ্জুরূপের জ্ঞানে সর্পাকার প্রত্যয়ের অভাব হইতে দেখা যায়, সেইরূপ। অতএব, বিষয় ও ফল দুএর কোনওটী অসম্ভব নহে, প্রত্যুত সুসম্ভব; সে জন্য—বেদান্তবিচার অবশ্য আরম্ভনীয়।

দ্বিতীয় বর্ণক।

বিষয়—বেদান্তবাক্য।

সংশয়—তাহা বিচার্য্য কি না। সংশয়ের বীজ—জৈমিনিকৃত মীমাংসা। জৈমিনি সমুদায় বেদভাগের মীমাংসা করিয়াছেন কি না? করিয়া থাকেন ত তৎসঙ্গে বেদান্তও মীমাংসিত হইয়াছে, পুনর্মীমাংসার প্রয়োজনাভব।

পূর্ব্বপক্ষ—জৈমিনি সমুদায় বেদ বিচার করত তত্তাৎপর্য্যে ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম তন্মতে মাত্র অর্থবাদ, তাহারও তাৎপর্য্য ধর্ম্মের দিকে। অতএব যেমন চর্ব্বিতচর্ব্বণ অনারম্ভনীয়, তেমনি বেদান্তবিচারও অনারম্ভনীয়।

সিদ্ধান্ত—জৈমিনি সমুদায় বেদের মীমাংসা করেন নাই, কেবল পূর্ব্বভাগেরই মীমাংসা অর্থাৎ প্রতিপাদ্যাদি নির্ণয় করিয়াছেন। বেদান্ত যদি তদীয় মীমাংসায় গতার্থ হইত, তাহা হইলে তদীয় গুরু সর্ব্বজ্ঞ বাদরায়ণ "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি ক্রমে ব্রহ্মবিচার উপদেশ করিতেন না। বেদের উপনিষদভাগ—তাহা তিনি কোনও সূত্রের বিষয় বাক্য করিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাহাও যদি ধর্ম্মতাৎ-

পর্য্যক হইত, তাহা হইলে জৈমিনি মীমাংসার পরিশিষ্টস্থলাভিসিক্ত করিয়া তিনি "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এরূপ সূত্র না করিয়া অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা এইরূপ সূত্র প্রণয়ন করিতেন। আরও দেখা যায়, জৈমিনির জিজ্ঞাসা (বিচার্য্য) ধর্ম্ম, তাহা দান হোমাদিরূপ সুতরাং তাহা কর্ত্তা, ক্রিয়া ও বাহ্যিক দ্রব্যগুণাদি সাধ্য। আর বাদরায়ণের জিজ্ঞাসা ব্রহ্ম, তাহা সাধ্যরূপ নহে, প্রত্যুত স্বতঃসিদ্ধরূপ। সুতরাং কর্ত্তা, ক্রিয়া ও দ্রব্যাদির অসাধ্য বা অনিষ্পাদ্য; সুতরাং তাহা কেবলমাত্র জ্ঞান-বিশেষের জ্ঞেয়। অতএব, ব্রহ্ম-মীমাংসা শাস্ত্রের বিষয়, ফল, অধিকার, সর্ব্ব-প্রকারে জৈমিনিকৃত মীমাংসা হইতে প্রভেদবিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হওয়াতে জানা যায়, ব্রহ্মমীমাংসা পূর্ব্বমীমাংসায় গতার্থ হয় নাই। যেহেতু গতার্থ হয় নাই, সেইহেতু নিঃসংশয়ে আরম্ভনীয়।

তৃতীয় বর্ণক।

বিষয়—বেদান্তবিচার।

সংশয়—আরম্ভনীয় কি না? সংশয়ের বীজ—অধিকারবোধক শ্রুতি। শ্রুতি যে বৈরাগ্যাদিমান্ অধিকারীর কথা বলিয়াছেন তাহা সম্ভব? কি অসম্ভব? সম্ভব হইলে বেদান্তবিচার আরম্ভনীয়, নচেৎ অনারম্ভনীয়।

পূর্ব্ব পক্ষ—বিবেক বৈরাগ্যাদি সুসম্ভব নহে, প্রত্যুত অসম্ভব। কদাচিৎ কারণ বশতঃ কাহার কাহার ঐহিক সুখাদিতে বৈরাগ্যাদি জন্মিতে পারে বটে; কিন্তু পারলৌকিক স্বর্গ সুখাদিতে বৈরাগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেননা,

"অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনাং সুকৃতম্"

ইত্যাদি শ্রুতিতে যাগের অক্ষয় পুণ্যফল হওয়ার কথা শুনিতে পায়। যেমন বৈরাগ্যাদি অসম্ভব, তেমনি মুমুক্ষাও অসম্ভব। কেননা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির নাম মোক্ষ—তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কথঞ্চিৎ কষ্টকল্পনায় যুক্তিসিদ্ধ করিলেও সুখ দুঃখাদিবর্জিত অবস্থা পাওয়া বাঞ্ছিত হইতে পারে না। সেই জন্য, অনারম্ভনীয় পক্ষই সুগ্রাহ্য।

সিদ্ধান্ত—যেমন অসহনীয় দুঃখের তাড়নায় ব্যক্তিবিশেষের লৌকিক সুখে বৈরাগ্য হওয়া সুসম্ভব, তেমনি,

"যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে"

ইত্যাদি শ্রুতি শ্রবণে লৌকিক স্বর্গাদি সুখেও বিতৃষ্ণা জন্মিতে পরে। "অতো-হন্যদার্ত্তং" ইত্যাদি শ্রুতি শ্রবণে বিশ্বাসে নিত্যানিত্যবিবেক প্রবৃত্তিও জন্মিতে পারে। "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে সর্ব্ব দুঃখের উপশম ও অপার স্বয়ংজ্যোতিঃপদ লব্ধ হয়" এতদর্থের শ্রুতি শ্রবণে মুমুক্ষাও সুসম্ভব হয়। জীবভাব অধ্যাসমূলক, সুতরাং অধ্যাস নাশে ব্রহ্মভাব, এবং ব্রহ্মভাবই পরমাশান্তি, এই সব উপদেশ শ্রবণ—মানুষকে ব্রহ্মাভিমুখী করিতে সমর্থ। সুতরাং ব্রহ্মবিচার অনারভ্য নহে, প্রত্যুত আরভ্য।

চতুর্থ বর্ণক।

বিষয়—শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মাত্মভাব।

সংশয়—তাহা বিচার্য্য কি না। সংশয়ের কারণ এই যে, সন্দিগ্ধ পদার্থেই বিচার প্রবর্ত্তিত হয়, অসন্দিগ্ধ পদার্থে নহে। ব্রহ্ম ও আত্মা যদি প্রসিদ্ধ বস্তু হন, তাহা হইলে বিচার অপ্রয়োজনীয়। যদি অপ্রসিদ্ধ হন তাহা হইলেও বিচার অপ্রয়োজনীয়। কেননা, অপ্রসিদ্ধের বিচার নিস্ফল। সুতরাং আবশ্যক হইতেছে যে, ব্রহ্মাত্মভাবে যদি অধ্যাস থাকা নিশ্চয়

হয় তবেই তাহা সন্দেহ প্রযুক্ত বিচার্য্য, নচেৎ নহে।

পূর্ব্ব পক্ষ—ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ; সুতরাং অসন্দিগ্ধ। আত্মাও "অহং" ইত্যাকারে প্রসিদ্ধ; সুতরাং অসন্দিগ্ধ। ব্রহ্মে অহন্তার অধ্যাস সন্দেহ করাও অকিঞ্চিৎকর। কেন না, উক্ত উভয়ের অধ্যাস দুর্নিরূপ্য। আলোকে কি অন্ধকারের সমাবেশ হয়? যেমন আলোকে অন্ধকারের সমাবেশ হয় না, তেমনি, নিত্য স্বপ্রকাশ চেতন ব্রহ্মেও অপ্রকাশস্বভাব জড় মনোবৃত্তি অহন্তার সমাবেশ বা অবস্থান সম্ভব হয় না। যুক্তির দ্বারা কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা প্রদর্শন করিলেও ফলাভাব বশতঃ উক্ত বিচার অনারভ্য। শত শত বার—লক্ষলক্ষবার "ব্রহ্মই জীব" "আমিই ব্রহ্ম" এরূপ ভাব উত্থাপন করিলেও এ পর্য্যন্ত কাহাকে মুক্ত হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং ব্রহ্মাত্মভাব অবিচার্য্য।

সিদ্ধান্ত—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি অসন্দিগ্ধভাবে ব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু অহংজ্ঞান "মনুষ্যোঽহম্" ইত্যাদি প্রকারে দেহাদির সহিত অধ্যস্ত আত্মাকে গ্রহণ করিতেছে। এই পক্ষদ্বয় দৃষ্টে সন্দেহ হইলে পশ্চাৎ জানা যায়, অহংবুদ্ধি অধ্যস্ত আত্মাকেই গ্রহণ করে, অর্থাৎ দেহাদির সহিত একলোল হইয়া উদিত হয়, চৈতন্যমাত্র অবলম্বনে উদিত হয় না। সে জন্য উহা অধ্যস্ত আত্মার গ্রাহী। অহং কখন দেহে, কখন ইন্দ্রিয়ে, কখন অন্তঃকরণে অবগাহন করে, সে জন্য উহা অনিয়ত ও অস্থির। অনিয়ত ও অস্থির বলিয়া ভ্রান্ত। অতএব, ব্রহ্ম বা আত্মা অধ্যস্ত ক্রমে প্রসিদ্ধ বলিয়া বিচারযোগ্য। বিচারের দ্বারা অধ্যাস অপনয়নের পর মোক্ষ হওয়া বিদ্বদনুভব ও যুক্তি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মাত্ম বস্তু অবিচার্য্য নহে; প্রত্যুত বিচার্য্য।

রামানুজ ভাষ্যানুযায়ী অক্ষরার্থ ও অধিকরণ।

রামানুজ।—অথ শব্দের অর্থ অনন্তর অর্থাৎ ধর্ম্মমীমাংসা জ্ঞানের অনন্তর। অতঃশব্দের অর্থ—পূর্ব্ববৃত্তের হেতুভাব। পূর্ব্ববৃত্ত এ স্থলে জৈমিনিকৃত ধর্ম্মমীমাংসা বা কর্ম্মতত্ত্বের হেতুভাব। কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানই, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহত্ত্বগুণযোগী পুরুষোত্তম। বৃহত্ত্বগুণ অর্থাৎ স্বভাবতঃ সদা সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, তারতম্যশূন্য, অসীম ও অসংখ্যেয় কল্যাণ গুণ। জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ ইচ্ছা পূর্ব্বক উপাসনা। করিবেক, এইরূপ একটী পদ উহ্য। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জ্ঞান বটে; পরন্তু তাহা ধ্যানরূপ। যাহার অন্য নাম উপাসনাও ধ্রুবাস্মৃতি। ধ্রুবা স্মৃতি অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপ্রবাহ বা মনোবৃত্তিপ্রবাহ, ইচ্ছা শব্দের অর্থ এখানে তৎসাধ্য ভক্তি শ্রদ্ধাদি।

অধিকরণ।

বিষয়—ব্রহ্মবিচার।

সংশয়—আরম্ভনীয় কি না?

সংশয়ের বীজ জৈমিনিকৃত মীমাংসা। জৈমিনি সমুদায় বেদের মীমাংসা করিয়াছেন? কি উপনিষদ ভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের মীমাংসা করিয়াছেন? যদি সমুদায় বেদার্থ মীমাংসিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মবিচার অনারভ্য অন্যথা আরভ্য।

পূর্ব্বপক্ষ—জৈমিনির বিচারে স্থির হইয়াছে যে,শব্দের অর্থবোধকতাশক্তি ক্রিয়াম্বিত পদার্থে পর্য্যবসন্ন। অর্থাৎ মনুষ্য যখন শৈশবে বৃদ্ধদিগের ব্যবহার পরম্পরা

দেখিয়া ও তাহাদের উচ্চারিত তত্তদর্থের বোধক শব্দ শুনিয়া একে একে পদার্থ-জ্ঞান সঞ্চয় করিতে থাকে তখন তাহারা কর, আন, রাখ, যাও, আইস, ইত্যাদিবিধ ক্রিয়াবোধক শব্দের যোগ ব্যতীত কেবল সিদ্ধ-বস্তু-বোধক শব্দ শ্রবণ দ্বারা পদার্থ-গ্রহ করিতে (যে শব্দের যে অর্থ তাহার জ্ঞান লাভ করিতে) পারে না। বস্ত্র আন, এই কথা শুনিয়া যদি কেহ বস্ত্র আনিতে যায় তাহা হইলে তাহার সেই গমনাদি প্রবৃত্তি বা চেষ্টাবিশেষ দৃষ্টে শিশুর মনে প্রথমত অনুমানাত্মক আন্দোলন বিশেষ জন্মে, পশ্চাৎ সে আলোচনা দ্বারা বস্ত্র কি? আনা কাহাকে বলে? তাহা জানিতে পারে। যদি কেহ "বস্ত্র" এই ক্রিয়াম্বয়বর্জিত কেবল শব্দ শতবারও উচ্চারণ করে আর শিশু যদি কাহাকেও কিছু করিতে না দেখে, তাহা হইলে শিশু বস্ত্র কি? তাহা শতবর্ষেও চিনিবে না। কোন্ শব্দ কি অর্থে শক্ত, তাহা অভিহিত প্রকারেই বিজ্ঞাত হইতে দেখা যায়, সুতরাং তদদৃষ্টে স্থির হয় যে, শব্দমাত্রেরই অর্থবোধকতা শক্তি ক্রিয়ান্বিত পদার্থে অর্থাৎ কৃতিসাধ্য বস্তুতে পর্য্যবসন্ন, নিষ্ক্রিয় বা ক্রিয়ার অসাধ্য সিদ্ধ বস্তুতে নহে। সুতরাং শব্দময় বেদের তাৎপর্য্য ক্রিয়াবিশেষনিষ্পাদ্য ধর্ম্ম নামক পদার্থেই পর্য্যবসন্ন। যাহা সিদ্ধ আছে, প্রত্যক্ষাদির গোচর তাহা মুখ্য পদার্থ নহে। সে সকল কতক ক্রিয়াসংস্কারক এবং ক্রিয়াকর্ত্তার সংস্কারক অর্থবাদ ও অনুবাদ। জৈমিনির এবংবিধ সিদ্ধান্ত দৃষ্টে ইহাই প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্ম মুখ্য বেদার্থ নহে। ব্রহ্ম ও জ্ঞানাদি সমস্তই ক্রিয়াঙ্গ বা ধর্ম্মবিধির পরিপোষক মাত্র, ধর্ম্মমীমাংসায় তাহা গতার্থ, সুতরাং তাহা পুনঃ আরম্ভ যোগ্য নহে।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

লঙ্কাকাণ্ড।

২। প্রস্তাব।

আমরা গতবারে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে লঙ্কাকাণ্ড বিবৃত করিয়াছি; বর্ত্তমান প্রস্তাবে অধ্যাত্ম-রামায়ণের সহিত উহার পার্থক্য প্রদর্শনই আমাদের লক্ষ্য। হনুমান সাগর পার হইতে সীতার সংবাদ লইয়া রামসমীপে প্রত্যাগত হইলে, মায়ামনুষ্য রাম সীতার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলিতেছেন রাম অব্যয় অদ্বিতীয় চিন্ময় ও আনন্দস্বরূপ। দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগেরই দুঃখ হইয়া থাকে। দেহাভিমানশূন্য মায়াতীত চৈতন্যময় রামের আবার দুঃখ কি? এই বলিয়া নিজেই উত্তর দিতেছেন, অনভিজ্ঞ লোকেরাই ইহাঁকে মায়াগুণবিজড়িত জানিয়া সুখী দুঃখী বলিয়া মনে করে। আমরা এই স্থলের দুই বিরোধী ভাবের প্রকৃত সামঞ্জস্য কি, স্থির করিতে পারিলাম না। মীমাংসা চিন্তাশীল পাঠকগণের হস্তে রাখিলাম।

দয়ানন্দ স্বরস্বতী ঈশ্বরের অবতারত্ব খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে ঈশ্বর "সপর্য্যগাৎ", তিনি সৃষ্টির সমস্ত বস্তুতে সমস্ত পরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন; এইরূপ অবস্থায় তাঁহার অবতারত্ব অসম্ভব। তিনি আপনাকে ব্যাপক হইতে ব্যাপ্যে না আনিলে কেমন করিয়াই বা অবতার হইবেন। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ এমনই বিচিত্র, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব

এমনই স্বাভাবিক যে তিনি কোন কালে নিরবচ্ছিন্ন পরিমিত দেহের মধ্যে—ব্যাপক হইতে ব্যাপ্যে আপনাকে আনিতে পারেন না। তিনি চিরকালই "নেদং" ইহা নহে ইহা নহে, এই শব্দের বাচ্য। রাম-কৃষ্ণাদি ঈশ্বরের অবতার ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বর প্রকারান্তরে ইদং শব্দের বাচ্য হইয়া পড়েন।

তবে যদি কেহ বলেন ঈশ্বর রামকৃষ্ণা-দিতে কি ছিলেন না, তাহার উত্তর এই যে ঈশ্বর ত সকল স্থানেই আছেন, তোমার আমার ও সকলের সত্তা ত তাঁহা দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তিনি এ সমস্ত হইতে অধিক, তিনি এ সকলেরই অতিরিক্ত। তিনি সৃষ্টিতে রহিয়াছেন, সৃষ্টি তাঁহা দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তিনি সৃষ্টি হইতেও অধিক। তাই বলিয়া তুমি আমি রাম কৃষ্ণাদি কেহই ঈশ্বর নহেন, সৃষ্টিও ঈশ্বর নহে।

ঈশ্বরের দেহ পরিমিত অথচ তাঁহার শক্তি অপরিমিত, তিনি শরীরে একস্থান-স্থায়ী, অথচ গ্রহ নক্ষত্রাদিতে তাঁহার স্থিতি, তিনি শরীরধর্ম্মী অথচ তিনি স্রষ্টা পাতা ও প্রলয়কর্ত্তা, যাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধ এ সমস্ত বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন ক-রিয়া নিজ নিজ তর্কজাল বিস্তার করিতে যান, তাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ।

বাইবেল শাস্ত্রের সমালোচক টমাস পেইন ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে বলিয়া-ছেন, ঈশ্বর আপন একমাত্র পুত্র ইশাকে মনুষ্যজাতির উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহা একভাবে অযৌক্তিক। যদি কেবল পৃথিবী ঈশ্ব-রের রাজ্য হইত, এবং এই একমাত্র পৃথিবীর কল্যাণকামনাই যদি তাঁহার লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে না হয় তিনি আপন একমাত্র প্রিয়পুত্রকে একদিন পৃথিবীতে পাঠাইতে পারিতেন। কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় অযুত অগণ্য লোক যাঁহার সৃষ্টি, হয় তিনি প্রতি গ্রহ উপগ্রহে তত্তৎ-স্থানীয় অধিবাসীবর্গের উদ্ধারের জন্য আপন এক এক পুত্রকে পাঠাইয়া থা-কেন, নয় তাঁহার একমাত্র পুত্র উক্ত পৃথিবীর কার্য্য সমাপনান্তে এখানে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া গ্রহ গ্রহা-ন্তরেও ক্রমান্বয়ে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া সকল স্থানের মুক্তির পথ প্রমুক্ত করিয়া দিতে-ছেন।

আমরা উপরে যাহা লিপিবদ্ধ করি-লাম, তাহা ধর্ম্মবিশেষের নিন্দা প্রচারের জন্য নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই অবতারবাদই বল মধ্যবর্ত্তিতাবাদই বল কোনটীই প্রকৃষ্ট উন্নততম ধর্ম্মের সহিত সমীচীন নহে। এবং যে পর্য্যন্ত আমরা অবতারবাদ বা মধ্যবর্ত্তিতাবাদ প্রভৃতি (dogma) কূট মতামত লইয়া আন্দোলন করিব, ততদিন আমরা প্রকৃত সত্য হইতে বহুদূরে বিচরণ করিব। যদি কোন দেশে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ণীত হইয়া থাকে তাহা এই দেশে। যদি কোন কালে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে আলোচিত হইয়া থাকে, তাহা বৈদিক যুগে ও উপ-নিষদের কালে। পৌরাণিক কালে শাস্ত্র-কারগণ সেই সুর বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অধিকারীর অভাবে ধর্ম্মকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অবতারের আ-শ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং নিজে-রাও কতকটা কূড় হারাইয়া ফেলিয়া-ছিলেন। ফলে এই দাঁড়াইল নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে অবতারবাদ স্থান

পাইল। এই অধ্যাত্ম রামায়ণে ভূরি ভূরি স্থান এইরূপ আছে

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥

এ সকল কথা ঈশ্বরপক্ষেই খাটে, হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্য রামচন্দ্রে "অগোচরাদি" বিশেষণ কিরূপে খাটিবে। ঈশ্বর যে প্রতি-হৃদয়ে বিরাজমান অথচ লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে না তাহা উল্লেখ করিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলিতেছেন

জানন্তি নৈব হৃদয়স্থিতং বৈ
চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ।

অর্থাৎ যেমন অজ্ঞ লোকেরা স্বীয় কণ্ঠগত সুবর্ণহার দেখিতে পায় না, তেমনি তাহারা হৃদয়স্থিত রামচন্দ্র বা ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। তাই বলি এই সকল কথা কি দেহধারী রামচন্দ্রের উদ্দেশে, না গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন সত্যসত্যই দেহধারী পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভবে।

আমাদের কোন সহযোগী পত্রিকা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন; অধ্যাত্ম রামায়ণকার তুলসীদাস কৃত্তিবাস সকলেই রামের অবতারত্ব দেখিতে পান, আমরা পাই না কেন। আমরা ইহার উত্তরে আর কি বলিব। আমরা ত রামজীবনের মূল পত্তন বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে যেরূপ দেখাইয়াছি তাহাতে রামের অবতারত্ব কোথাও পাই নাই। অধ্যাত্মরামায়ণাদি ত পরবর্ত্তী সময়ের লেখা। তুলসীদাস কৃত্তিবাসের লেখা ত আরও আধুনিক। এরূপ অবস্থায় সহযোগী প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য অন্ততঃ সত্যের অনুরোধে কোন্ রামায়ণের উপর নির্ভর করিতে চান?

সে যাহা হউক এদিকে রামের সহিত বিভীষণের সাক্ষাৎ হয় নাই অথচ (অধ্যাত্মরামায়ণকারের কথায়) শ্রীরামপাদযুগলে একাগ্রচিত্ত ভাগবৎপ্রধান সুধীশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাবণের নিকট আসিয়া কহিলেন, যিনি অব্যক্তরূপে জগৎ সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন, সেই ভগবান্ ব্রহ্মার প্রার্থিত বরে রামরূপে তোমাকে সংহার করিতে আসিতেছেন। তিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার উদ্দেশ্য কে অন্যথা করিবে? তুমি সাবধান হও, সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, এই বলিয়া রাবণের বিরাগভয়ে লঙ্কা হইতে পলায়ন করিয়া রামের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন প্রভো! সংসার মোচন না হইলে ভয় মোচন হয় না, তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। রাম উত্তর করিলেন,

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম। ৩। ১২।

যে ব্যক্তি আমার নিতান্ত অনুগত হইয়া বলে যে আমি তোমার, আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অভয় দান করি, ইহাই আমার ব্রত! পরে বিভীষণ ঈশ্বরভাবে রামের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত বিভীষণের সখ্য স্থাপিত হইল। সমুদ্রকে রাম ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে সে ভীত হইয়া রামকে কহিল, নল আমার উপর সেতু বন্ধন করুক। রামচন্দ্র সেতু বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়া লোকহিতার্থ তথায় রামেশ্বর শিব স্থাপনা করিলেন এবং তাহার পূজা করিলেন। (যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া রামাদির অবতারত্ব প্রভৃতি পুরাণের প্রতি কথায় বিশ্বাস করিতে যান, জানি না তাঁহারা গললগ্নীকৃতবাসে সমুদ্রের আগমনাদি অর্থে কি বুঝেন)।

রাবণ-প্রেরিত শুক রামের সৈন্য সামন্ত দর্শনান্তে রাবণের নিকট প্রত্যাগত হইল, কিন্তু কিছুতেই রাবণের চৈতন্য উদ্রেক করিতে পারিল না। বরং রাম-দর্শন ফলে শাপাবসানে নিজেই পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ হইল। অনন্তর রাক্ষস বানরে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণও রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। রাবণ-প্রেরিত শক্তিশেল মহাতেজে আসিয়া লক্ষ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইল। লক্ষ্মণ মনুষ্যভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাবণ বিংশতি হস্তেও সেই বিরাটরূপী পরমেশ্বরকে উত্তোলন করিতে পারিল না। তদ্দৃষ্টে রাম কুপিত হইয়া শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, রাবণ সে তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ত্বরায় ম্রিয়মান হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

রাম লক্ষ্মণকে তখনও মূর্চ্ছিত দেখিয়া লীলামনুষ্য ভাবে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। হনুমান মহৌষধি আনয়নার্থ সাগরপারে প্রেরিত হইল। এদিকে রাবণপ্রেরিত মুনিবেশধারী কালনেমি হনুমানের পথবিঘ্ন ঘটাইবার জন্য গমন করিল। হনুমান তাহার ছলনায় পড়িয়া জলাশয়ে জলপান করিতে গিয়া এক মকরী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। হনুমান তাহাকে বিদারণ করিয়া ফেলিলে তাহার দেহ হইতে ধান্যমালী নাম্নী এক অপ্সরা শাপ-মুক্তা হইয়া হনুমানকে, রাক্ষস কালনেমির চক্রান্ত বুঝাইয়া দিলে, হনুমান রাক্ষসকে মুষ্ট্যাঘাতে বিনষ্ট করিল। হনুমান অবিলম্বে ঔষধি লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুষেণের চিকিৎসায় লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করিলেন। এদিকে রাবণ লঙ্কায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাক্ষসগণকে কহিল, রাম সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণ, ব্রহ্মার নির্দ্দেশ মতে তাঁহারই হস্তে আমার মৃত্যু হইবে দেখিতেছি। এক্ষণে কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়া আমার নিকটে আনয়ন কর। ফলত এ সকল বৃত্তান্ত মূল রামায়ণে কিছুই নাই।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর সেন প্রণীত ভূপ্রদক্ষিণ নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তৎপাঠে কলিকাতা হইতে এক পা অগ্রসর না হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণের অনুপম আনন্দ চৌকি হেলান দিয়া উপভোগ করিলাম। দেখিলাম যে ইওরোপ পৃথিবীর আদর্শ-স্থল এবং ইংলণ্ড ইওরোপের আদর্শস্থল। দেখিলাম যে, ইওরোপ হইতে এক পা বাহির হইলেই এসিয়াটিকদিগের হীনাবস্থা পরিব্রাজকের নয়ন মনে অসহনীয় বিরাগ সঞ্চার করে। গ্রন্থের প্রণেতা যিনি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন—রহিয়া রহিয়া তাঁহার হৃদয়ের দক্ষিণ দিক দিয়া উল্লাস ধ্বনির প্রদীপ্ত হুতাসন এবং বাম দিক দিয়া খেদোক্তির কৃষ্ণবর্ণ ধূম এট্‌না জিনিয়া প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া একদিক হাসাইতেছে এবং আর এক দিক কাঁদাইতেছে; পশ্চিম দিক হাসাইতেছে এবং পূর্ব্বদিক কাঁদাইতেছে। সেই সেই সময়ে আমরা তাহার তোড় সামলাইতে না পারিয়া সভয়ে কতক হাত অন্তরে পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেছি—সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার উল্লাস ধ্বনিতে উল্লাসধ্বনি এবং বিলাপ ধ্বনিতে দীর্ঘ নিশ্বাস হাহুতাশ এবং অশ্রুজল না মিসাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এটাও

...লিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি-
...না হে, তাঁহার হস্তে একটা স্বনির্ম্মিত দূরবীন রহিয়াছে; যখন তখন তিনি সেই দুর্বিনের সোজা দিক্‌দিয়া ইংলণ্ডের তিল'কে তাল দেখিতেছেন এবং দুর্বিনের উল্টাদিক্ দিয়া এদেশের তালকে তিল দেখিতেছেন; ইংলণ্ডের সামান্য মহৎ ব্যক্তিকে প্রকাণ্ড মহৎ দেখিতেছেন, আর, এ দেশের আদর্শস্থানীয় মহদ্ব্যক্তিকে ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর দেখিতেছেন; কাহারো পিট্‌থাব্‌ড়ানো রোগের মধ্যে অসামান্য মহত্ত্বের লক্ষণ দেখিতেছেন, কাহারো আজীবন সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনা এবং অটল নিষ্ঠা, আর, স্বদেশ-কৃত তদুপযুক্ত সম্মান-প্রদশ... ...ধ্যে 'স্বকৃত' আত্মপূজা ...খিতেছেন ... ...খন তালীভূত তি...
—...

...্য মনে...
...ক ...
...ুনী আমরা ... ও অনেক বিষয়ে তাঁহার ব্যথার ব্যথী তথাপি আমাদের সহজ চক্ষুর সহিত ওরূপ দুর্বিনের কোনো সম্পর্ক নাই; তা ছাড়া, আমাদের অপেক্ষা তিনি নিজে এ কথা আরো খুব ভাল করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, আর অনেক স্থলে তাহা করিয়াওছেন, যে, ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাদের স্বদেশীয় মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি ওরূপ উল্টাদিক্ দিয়া দুর্বিন কসেন না। পরিব্রাজক পুরাতন গ্রীসের একটী প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ভিনসের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্যের ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—না পারিয়া আক্ষেপ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কিন্তু তাহার প্রতি ঘুণাক্ষরেও দোষারোপ করিতে সাহসী হন নাই; এইরূপ করিয়া—মহতের গুণগ্রহণে অসমর্থ হইলে মনের ভাব কিরূপ কথায় ব্যক্ত করিতে হয় তাহার একটী সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমানস্থলে সেই দৃষ্টান্তের ঠিক উল্টা পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার একস্থানে আপনিই বলিয়াছেন, যে ইলণ্ডের কলীয় ভাবটা (অর্থাৎ খাওয়া পরা শোয়া কলে চলিতেছে এই ভাবটা) তাঁহার মনের সহিত ঐক্য হইল না। ভালবাসা বল' বন্ধুতা বল' আমোদ আলাপ বল' সমস্তই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—কি? না কলীয় এবং প্রাণীয় অর্থাৎ ...হ্য-শোভন এবং আন্তরিক। কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা পৃথিবীতে যেরূপ (বিশেষত এই কলিকালে) তাহাতে প্রাণীয় বস্তুর প্রতি লোকের বিশ্বাস হয় না এবং বাস্তবিকও তাহাতে বিশ্বাস নাই। চীন দেশে অনেক সময়ে অপরাধীর লঘু পাপে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে অতীব সুমিষ্ট ভাষায় বলা হয় যে এটা জানিও পিতার শাসন, ইহাতে পরিণামে তোমার ভাল হইবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভূতের শাসন কি পিতার শাসন তাহা বলা সুকঠিন। এইরূপ মুখে প্রাণের ভাব এবং কাজে প্রাণবধের ভাব অনেকের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রাণীয় উপাধিতে বিভূষিত হয়। এইরূপ কলিকালের প্রাণীয় ভাব অপেক্ষা কলীয় ভাব সহস্রগুণে ভাল। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে বাস্তবিক প্রাণীয় ভাব (সত্য যুগের প্রাণীয় ভাব) কলীয় ভাব অপেক্ষা সহস্রগুণে

ভাল। সত্য কথা বলিতে কি—বাস্তবিক প্রাণীয় ভাব, রাম লক্ষ্মণের মধ্যে যেরূপ পূর্ব্বে ছিল সেইরূপ প্রাণীয় ভাব, প্রাচ্য প্রদেশের একটী বিশেষ সম্পত্তি। কিন্তু আমাদের দেশে ঢাকাই মলমলের ন্যায় সেই দেশী জিনিসটা এক্ষণে খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তাহার বদলে অনেক বিলাতী জিনিস অতীব সস্তা দরে বিক্রীত হইতেছে। পূর্ব্বে ছিল—গৃহে ভদ্র লোক আইলেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসানো; এখন হইয়াছে নাম লেখা টিকি-টের বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এক্ষণে যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে কলীয় ভাব দরকার—"যস্মিন কালে যদাচারঃ"। পূর্ব্বে অভ্যাগত ভদ্রলোককে দেখিলেই জানিতে পারা যাইত ইনি ভদ্রলোক; এখন যাঁহার ললাটে টিকিট মারা আছে তিনিই ভদ্রলোক, তদ্ভিন্ন অপর সকলে অভদ্র বলিয়া পরিগণিতব্য। আসল কথা এই যে, দেশী বিলাতী ভাব—খাস্ বিলাতী ভাব অপেক্ষা অতীব নিকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আসল দেশী ভাব বিলাতী ভাব অপেক্ষা কোন অংশে হেয় নহে বরং অনেক অংশে উৎকৃষ্ট; যদিচ তাহা নিতান্তই চাকচিক্য-বিহীন, আর, সেই কারণে কলিকাতার হট্ট-গোলের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। আমি কি বলিতেছি পাঠক তাহা ভালকরিয়া বুঝুন্। মনে কর একটী দরিদ্র অথচ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ একটা কুটীরে বাস করিয়া দিব্য সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন। হইতে পারে তিনি ইওরোপীয় বিজ্ঞানের চৌকাট মাড়ান নাই; দেশীয় পুঁথির পাতার অভ্যন্তরেই আর দেশীয় ভ্রাতৃগণের গৃহাভ্যন্তরেই তাঁহার গতিবিধি আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তিনি কলের পুতুল নহেন। তিনি সজীব মনুষ্য। তিনি [illegible] বাসার নানা প্রকার কেতা এ[illegible] চাতুরী অভ্যাস করেন না—আয়নার সম্মুখে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া কলার্ (অর্থাৎ গলাবন্ধ) পরিপাটীরূপে গুছাইয়া তোলেন না। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া দেবারাধনা করেন, চতুষ্পাঠীতে পঠন পাঠন করেন। তাঁহার কর্ম্মিষ্ঠা গৃহিণী রন্ধনাদি করেন; কুঁড়ে ঘরটিকে নিকাইয়া চুকাইয়া ঝরঝরে পরিস্কার করেন; ইহাতে একটী পয়সাও খরচ হয় না। ব্রাহ্মণ স্নানাদি করিয়া সাত্ত্বিক অন্ন ভোজনে পরম পরিতৃপ্ত হন। তিনি পাড়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব চাষাভুষা ও গ্রামের বর্দ্ধিষ্ঠ লোক সকলেরই সুখে সুখী [illegible]খে দুঃখী; তাঁ[illegible]র পরিধান বস্ত্র [illegible] দেহ পরি-
স্কা[illegible] পরিষ্কার
[illegible]তি আদর্শ
[illegible]
[illegible]
[illegible]রিতে
[illegible] তাহা
তাহা হইলেই তাঁহার চক্ষু ফুটিবে। বৃহৎ একটা অট্টালিকায় বাস করিবেন অথচ তাহা রীতিমত পরিষ্কার রাখিবার জন্য টাকা খরচ করিয়া চাকর বাকর রাখিতে কুণ্ঠিত হইবেন এরূপ করিলে চলিবে না। ঘড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে ইস্প্রিঙ্ চাই, কাঁটা চাই, দোলক চাই এ সমস্তেরই আয়োজন চাই; ইহার একটী কোন কিছুর অভাব হইলেই ঘড়ির ঘড়িত্ব ঘুচিয়া যাইবে। তা ছাড়া—ঘড়ি প্রস্তুত হইলে তাহা মেরামত করিবার জন্য একটা নিপুণ কারিকর সর্ব্বদা তাহার পিছনে

জাগিয়া থাকা চাই। অতএব হয় কলীয় ভাবের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহণ কর নয় তাহার কিছুই গ্রহণ করিও না। যাপানীরা তাহাদের স্বদেশের প্রাণীয় ভাব বলপূর্ব্বক নিচে দাবিয়া রাখিয়া কলীয় ভাবের সমস্তটা এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়াছে তাই তাহাদের পার্থিব অভ্যুদয় অল্প দিনের মধ্যে এরূপ মাথা চাগাড় দিয়া উঠিয়াছে। প্রাণীয় ভাবের অবমাননানিবন্ধন পরিণামে তাহাদের কি হয় তাহা বলা যায় না।

কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—ইংলণ্ডে স্বদেশের প্রাণীয় ভাবের বীজ হইতে কলীয় ভাব ক্রমে ক্রমে যখন যেমন আবশ্যক তখন তেমনি অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, বিস্তৃত, বিকসিত এবং ফলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য তাহার সে কলীয় ভাব
সংহার করিতে
সুন্দররূপে
প ইং-
কাণ্ডের
সৌজন্য
ষ্ঠতা—
বং স্বর্গীয়
ণ্যসলিলা
হত হইয়া
দিক্ প্লাবিত
ব তাহার
শীয় প্রাণী প্রতিষ্ঠিত
তাই তাহা সোণায় সোহাগা হইয়াছে। ইংলণ্ডে স্বদেশের হৃদয়ের সহিত সার্ব্বদৈশিক বিজ্ঞানের মাখামাখি হইয়া একটি নূতন মূল্যবান্ বস্তু গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কোনো দেশের স্বদেশী প্রাণীয় ভাব যে বিদেশীয়েরা অনুকরণ করিবেন—সে দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ। আমরাও ইংলণ্ডের স্বদেশী প্রাণীয়ভাব অনুকরণ করিতে পারি না; ইলণ্ডবাসীরাও আমাদের এদেশী প্রাণীয় ভাব অনুকরণ করিতে পারে না। আমাদের স্বদেশের প্রাণীয় ভাবের মধ্য হইতে যদি অল্পে অল্পে কলীয়ভাব অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত শাখায়িত এবং ফলিত হইয়া উঠে তবেই আমাদের মঙ্গল; তা ভিন্ন—কলীয় অনুকরণে হিতে বিপরীত হইবার খুবই সম্ভাবনা। এখানে এই একটী কথা আসিতে পারে যে ইন্দ্রের অমরাবতী ভাল কি কণ্বমুনির তপোবন ভাল—চক্ষের স্বর্গ ভাল কি হৃদয়ের স্বর্গ ভাল। এই প্রশ্নের বিচার গ্রন্থকারের নিকট হইতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, কেন না তিনি টাট্‌কা টাট্‌কি অমরাবতী হইতে নামিয়া আসিতেছেন।

এই সকল দুই পক্ষের দুই বিরোধি কথার তরঙ্গদোলায় নৌকা ডুবি না করিয়া কিনারায় দাঁড়াইয়া আসল কথাটা কি তাহা একবার স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্‌। আসল কথা হচ্চে জ্ঞান প্রেম এবং ধর্ম্ম। বাঙ্গালী জাতিকে কাহারও কোন পরিচ্ছদ এবং চাল চলনের কেতার অনুকরণ করিতে হইবে না। কিন্তু জ্ঞান বিলাতীও নহে দিশীও নহে। জ্ঞানের আদান-প্রদানে সকলেরই সমান অধিকার। অতএব বিজ্ঞান আর সেই সঙ্গে টাকা করিবার উপায় বিদেশীয়দিগের নিকট শিক্ষা করা হউক। বিজ্ঞানকে কার্য্যে খাটাইতে গেলেই তাহা কল-কারখানার আকার ধারণ করে। এই জন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রীকরণের (organisation এর) প্রণালী পদ্ধতি শিক্ষা করা হউক। দেশী প্রাণীয় ভাব রক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে বিলাতী কলীয় ভাব জুড়িয়া দেওয়া হউক। কিন্তু কল কারখানায় বিধিমতে লিপ্ত হইলে প্রাণীয় ভাবের অনেকটা বিচ্যুতি আশঙ্কনীয়; তাহার ঔষধি—জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানোপযোগী ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ। ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য করুনা-প্রভাবে আমাদের দেশে জ্ঞানোন্নতি এবং ধর্ম্মোন্নতি দুয়েরই পথপ্রদর্শক হইয়া রামমোহন রায় ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহাত্মাগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের যত্ন ও পরিশ্রমে জ্ঞানের জন্য কলেজ এবং ধর্ম্মের জন্য ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইয়াছে। দেশশুদ্ধ লোক রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথে প্রধাবিত

হইতেছেন কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্মের পথ অনুসরণ করিতে অবহেলা করিতেছেন তাই আমাদের দেশের এরূপ দুর্গতি। ঘড়ির ইস্প্রিঙ্ ছাড়িয়া ঘড়ির কাঁটার দিকেই সকলের দৃষ্টি প'ড়িয়াছে। কাজেই ঘড়ি অচল।

যাহা হউক্ গ্রন্থকারের পুস্তকখানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে কালচক্রের পেষণে আমরা যে কতদূর অবনত হইয়াছি সে বিষয়ে আপামর সাধারণ সকলেরই চক্ষু ফুটিবে। তাহা পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলের সুবিস্তৃত ভোজে উপবিষ্ট হইয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের পথপ্রদর্শক কোনো কোনো বিলাত ফের্ত্তার ন্যায় কোর্ত্তাধারী কলের কাষ্ঠপুত্তলিকা নহেন—তাঁহার ভিতরে প্রাণ ধড় ফড় করিতেছে; আর তাঁহার হৃদয়ের ভিত্তিমূল হইতে ভগবদ্ভক্তি এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম এরূপ মর্ম্মান্তিক ভাবে উদ্গীরিত হইতেছে যে, তাহার আকর্ষণ অনিবার্য্য। এই প্রকার পৃথিবী পর্য্যটন বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে বঙ্গভাষায় এই প্রথম ভূমিষ্ঠ হইল—এজন্য গ্রন্থকারকে হৃদয়ের সহিত অভিনন্দন করিতেছি—আর, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার এই সুকৃতী সন্তান দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গের চক্ষু ফুটাইয়া দিক্।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৫৪৶৬
পূর্ব্বকারস্থিত	...	২৭৬৭৶৩
সমষ্টি	...	৩৪২১।৵৯
ব্যয়	..	৭৭৬।৬
স্থিত	...	২৬৪৫৵৩

জায়

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	২০০০৲
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৵৩
	২১৩৮৵৩
	২৬৩৮৵৩
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
	২৬৪৫৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২১৭৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০০৲
সাম্বৎসরিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী	৫৲
আনুষ্ঠানিক দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	১৲
" " প্রাণকৃষ্ণ সরকার	১৲
	২১৭৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৭৸৵০
শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার দা[illegible]	
" " গিরিজা[illegible]	
" " নী[illegible]	
" রায়[illegible]	
" বাবু [illegible]	
" " র[illegible]	
" " ম[illegible]	
" " তু[illegible]	
" " ক[illegible]	
" " দ্বা[illegible]	
" " গে[illegible]	
" " হ[illegible]	
" " শ্রী[illegible]	
৺ " জয়[illegible]	
পুস্তকালয়[illegible]	
যন্ত্রালয়	৩৮৭৵৩
গচ্ছিত ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২॥০
সমষ্টি	৬৫৪৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৩৫।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪০।৬
পুস্তকালয়	...	৪৫ ৻৬
যন্ত্রালয়	...	২২২৸৶৯
গচ্ছিত	...	৬৭ ৻৯
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	৬৫॥০
সমষ্টি		৭৭৬।৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫৩ সংখ্যা　　　　　　　　　　১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৯ শক। ২৮এ আশ্বিন বুধবার।

সন্তোষ।

একদা শরৎকাল সমাগত হইলে, আমি প্রাতঃকালীন পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলাম। সম্মুখেই এক বৃহৎ প্রান্তর ও সরোবর ছিল। দেখিলাম নবোদিত সূর্য্যকিরণে পদ্ম সকল সরোবরে শোভা পাইতেছে। আমি প্রান্তর উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া দেখি কোন দুই জন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পরস্পর ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করিতেছে। তন্মধ্যে এক জন কহিল, আমি বহুকাল আমার ধর্ম্মসাধন করিয়া পরিশেষে আমার দেবতার নিকট এক অপূর্ব্ব রত্নমণি পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছি। ইহার ভিতর এক তেজোময় পদার্থ আছে, যাহার বলে ইহা অদ্ভুত শক্তি ধারণ করে। ইহা যে দ্রব্যের নিকটে থাকে, সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা সূর্য্যে জ্যোতি ও হীরকে নির্ম্মল প্রভা সঞ্চিত করে। ইহা সকল ধাতুর তেজের কারণ, এবং লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। ইহা ধূমকে অগ্নিশিখায়—অগ্নিশিখাকে আলোকে, আলোককে মহিমান্বিত জ্যোতিতে পরিণত করিতে পারে। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার শরীর হইতে ব্যথা, ও মন হইতে দুর্ভাবনা ও বিষাদ দূর হইয়া যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহা যে স্থানে থাকে, তাহাকে স্বর্গের সমান করিয়া তুলে। এই সকল কথা শুনিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলাম। পরে বুঝিলাম, বক্তা ঠিকই বলিতেছে। তাঁহার কথিত বিষয় রূপকের ছলে বলিতেছে। বাস্তবিকই এই মণির সহিত, সন্তোষ-ধর্ম্মের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। যদিও ইহা সত্য সত্য ধন ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা মন হইতে ধনের উৎকট বাসনা দূরীভূত করিয়া ধনপ্রাপ্তির অনুরূপ ফল বা তৃপ্তি দান করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যকে সকল প্রকার কষ্টে সহনশীল করিতে পারে। সন্তোষপরায়ণের মনে যে একটি

বিশেষ শক্তি—কোমল ভাব আছে, তাহা তিনি অপরের আত্মায় বিদ্যুৎ-গতিতে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন। ঈশ্বর যে অবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়াছেন, তাহার উপর তাঁ-হার কিছুতেই বিরাগ জন্মে না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর যে ভক্তি তাহা দুর্ভাগ্যকালেও বিচলিত হয় না। তিনি কখনও অকৃতজ্ঞ হয়েন না। তিনি প্রতিবেশীর কুলশীল সুখসৌভাগ্য দেখিয়া, লোভ বা পাপ-দূষিত কামনার বশীভূত হয়েন না। সন্তোষ তাঁহার কথোপকথনে মধুরত্ব ও চিন্তায় স্থিরভাব সমুৎপাদন করে।

সন্তোষ উপার্জ্জনের যে যে উপায় আছে, তন্মধ্যে আমি এখানে দুইটির উ-ল্লেখ করিব। প্রথমতঃ মনুষ্যের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যাহা তাঁহার প্রকৃত অভাব, তাহা অপেক্ষা তাঁহার কত অধিক আছে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বর্ত্ত-মানে যত অসুখী তাহা হইতে আরো কত অধিকতর অসুখী হইলেও হইতে পারিতেন। প্রথম প্রস্তাবটি ধনীদিগের ও দ্বিতীয়টি দুঃস্থদিগের বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কোন এক সন্তোষপরায়ণ ধনী ব্যক্তির চারিখানি ক্ষেত্র ছিল, কোন গতিকে তিনি তাহার মধ্য হইতে এক-খানিতে বঞ্চিত হইলেন। তজ্জন্য এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট দুঃখ প্রকাশ করি-তেছিল, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমার ত এখনো তিন খণ্ড ক্ষেত্র আছে, তোমার ত একখণ্ড বই নাই। আমার বরং তোমার জন্য দুঃখ করা উচিত।

নির্ব্বোধেরা যাহা গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করে, যাহা আছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। তাহারা আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর ধনীদিগের উপর দৃষ্টি স্থির রাখে, কিন্তু অধিকতর দুঃস্থদিগের অবস্থার প্রতি চাহিয়া দেখে না। জীব-নের প্রকৃত সুখ সচ্ছন্দতা যৎসামান্য উপকরণের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু মনুষ্যের কেমন স্বভাব, যে, সে কেবল উচ্চ হইতে উচ্চ অবস্থার প্রতি চক্ষুঃ রাখিতে ভালবাসে, এবং কি প্রকারে আপনা হইতে ধনে মানে শ্রেষ্ঠতর ব্য-ক্তিকে পরাস্ত করিবে, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। এরূপে দেখিতে গেলে, যাহার নিজ অভাব পূরণ অপেক্ষা অধিকতর ধন না থাকে তাহাকে আর ধনী বলা যায় না।

সভ্যতাভিমানী ধনীদিগের অপেক্ষা বরং মধ্যবিত্ত লোকদিগকে এক রূপ ধনী বলা যাইতে পারে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকেই আপনার অবস্থাকে অতি-ক্রম করিয়া চলে না। তাহাদের এত উদ্বৃত্ত হয়, যে তাহা লইয়া তাহারা কি করিবে, বরং ভাবিয়াই অস্থির। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা একরূপ সমুজ্জ্বল দারিদ্র্যের মধ্যেই থাকে। তাহাদের সকল সময়েই অভাব বোধ হয়। তাহারা জীবনের প্রকৃত সুখে সন্তুষ্ট না হইয়া সুখের ছায়ায় আসক্ত হইয়া জিগীসার বশবর্ত্তী হয়। জ্ঞানীগণ সকল সময়েই তাহাদের এই বৃথা ক্রীড়া দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদের বাসনা খর্ব্ব করিয়া সেই সকল গূঢ় আনন্দ ভোগ করেন, যাহা অন্যে চিরদিনই অন্বেষণ করিয়াই বেড়ায়। প্রকৃত কথা এই, কাল্পনিক সুখের অনুসরণ যার পর নাই নিন্দনীয়। ইহা মহৎ মহৎ বিপদের উৎপত্তিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার জন্যই ধরণীস্থ প্রধান প্রধান জাতিই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যের বিষয় সম্পত্তি যতই কেন অধিক

হউক না, বুঝিয়া চলিতে না পারিলে—অবস্থাচক্রের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে না শিখিলে তিনি চিরকালই দরিদ্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সন্তোষই ঐশ্বর্য্য ও বিলাসই দারিদ্র্যের অনুরূপ। সন্তোষই স্বাভাবিক অর্থ—বিলাসই কৃত্রিম দারিদ্র্য। যাহারা সর্ব্বদা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুখসামগ্রীতে আসক্ত ও কিছুতেই আপনাদের বাসনাকে খর্ব্ব করিতে চাহে না, তাহাদিগকে আমি কোন এক জ্ঞানীর কথায় বলি যে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুখের আশায় লালায়িত হয়, সে যেমন দুশ্চিন্তার অধীন হয়, এমন আর কেহ হয় না। সন্তোষ লাভের দ্বিতীয় উপায় আমি পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি, প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত যে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও অধিকতর শোচনীয় অবস্থা ঘটিলেও ঘটিতে পারিত। বিশেষতঃ দুঃখী ও বিপন্ন লোক আপনার দুঃখের সহিত অন্যের দুঃখের তারতম্য করিলে অনেক সান্ত্বনা পাইতে পারেন। দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। একজন ওলন্দাজ জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মাস্তর হইতে পতিত হইয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে বলিলেন, ঈশ্বরের করুণা বলিতে হয়, যে আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায় নাই।

এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানবেত্তা ভোজ উপলক্ষে তাঁহার বন্ধু বান্ধবকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সকলে আহারাদি করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার স্ত্রী ভোজনকক্ষে ক্রোধান্বিত হইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সম্মুখস্থ টেবিল সজোরে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি কহিলেন, সকলেরই দুঃখ দুর্ভাগ্য আছে, আমিত সুখী, যে আমার ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ করিবার কারণ নাই। এক জন ডাক্তার বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার পাথরী রোগ হয় নাই। পরে যখন তাঁহার পাথরী রোগ হইল, তখন বলিলেন, ইহাও সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে বাত ও পাথরী উভয়ে এক কালে উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, তাহার জন্য পুরাকালের অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে অসন্তোষ কেবল দুঃখই বৃদ্ধি করে, অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অপরে বলেন দুঃখ দুর্ভাগ্য অদৃষ্ট নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, দেবতারাও ইহার অধীন। আবার অনেকে গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেন, তোমার দুঃখী হওয়া অনিবার্য্য, যে হেতু তাহা না হইলে বিশ্ব সংসারে একটা সামঞ্জস্য থাকে না, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এই প্রকার যুক্তি ও প্রবোধ বাক্য শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা না দিয়া বরং নিস্তব্ধই করিয়া তুলে। এই সকল যুক্তি দ্বারা অসন্তোষকে দূর করা যায় না। তৎসমুদায় সান্ত্বনার স্থলে বরং নিরাশাই আনিয়া দেয়।

একদা অগস্টস্ সিজার তাঁহার প্রিয়জন-বিয়োগ-বেদনায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কোন এক বন্ধু বলিলেন, "কেন মিছে ক্রন্দন কর, তুমিত আর তাহাকে ফিরিয়া পাইবে না।" সিজার বলিলেন—"সেই জন্যইত কাঁদিতেছি।" দুঃখ দুর্দ্দিনে অনেকেই আমাদিগকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে আমাদের দুঃখ দূরও হয় না, অসন্তোষও যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ বিষয়ে মধুর উপদেশ দান করেন। তিনি

বলেন, এ লোকে তোমার সকল আশা আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। পরলোকে বিরহ বেদনা থাকিবে না। প্রিয়জনের মিলন আশা সেখানে। সেখানে সকল দুঃখের অবসান হইবে। এখানে কেবল তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাক। তাহাতেই শান্তি-সুখ মিলিবে। আর বিপদকালে ব্যথিত না হইয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে কার্য্যোপায়ে তৎপর থাক। অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর। আপনার অবস্থাকে ভগবানের চক্ষের উপর উন্নত করিতে চেষ্টা কর। তিনি তোমায় সাহায্য করিবেন। তিনি না দিলে কেহ কিছু করিতে পারে না। গৃহ গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি যাহা যাহা সংসারে প্রয়োজন, তাহা দুর্লভ মনে করিও না। ন্যায়ানুসারে তাহা উপার্জ্জন কর। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় লাভের জন্য দুরাকাঙ্ক্ষ হইও না। সততঃ সেই স্পর্শমণিকে হৃদয়ে রক্ষা কর। সকল প্রকার দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইবে।

হে দেব! যাহাতে আমরা সুখে দুঃখে তোমাকে না ভুলি, তোমার সন্তোষ-ধর্ম্ম লাভ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এপ্রার শক্তি দান কর।

"ডাকে এ কুটীরবাসী অতিশয় যতনে।
মুক্ত কর মলিন মন, অশ্রুবারি নিক্ষেপণে॥
তুমি আমার স্পর্শমণি, আঁধার ঘরের আলো।
সুখ শান্তি সবই তুমি শুভ্রালোক এ জীবনে॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তভাষ্য—ব্রহ্মসূত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সিদ্ধান্ত—শৈশবের জ্ঞানসঞ্চারক্রম ঐরূপ হইলেও, শব্দের বস্তুবোধকতা শক্তি যে কেবল ক্রিয়ান্বিত পদার্থেই পরিসমাপ্ত, তাহা নহে। সিদ্ধ পদার্থেও ক্রিয়ান্বয়বর্জ্জিত শব্দের বোধকতা শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। "তোমার পুত্র সুশীল" এই শব্দ শ্রবণের পর শ্রোতার মুখে হর্ষ চিহ্ন উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারা বুঝিয়া লও যে, স্থিত বস্তুর বোধক অনন্বিতক্রিয় শব্দও স্থিত বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে সক্ষম। অতএব, জৈমিনির উক্তবিধ সিদ্ধান্ত ধর্ম্ম বিষয়েই ব্যবস্থাপিত, ব্রহ্মবিষয়ে নহে। অর্থাৎ জৈমিনি মুনি মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে বেদপূর্ব্বভাগের অর্থাৎ বিধিনিষেধ ঘটিত কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদরাশির মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, উত্তরভাগের অর্থাৎ উপনিষদ ভাগের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যবস্থাপন করেন নাই। জৈমিনির মীমাংসায় ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ার্থ উত্তরভাগ (উপনিষদ) গতার্থ না হওয়ায় বাদরায়ণ মুনি কর্ত্তৃক তাহা আরম্ভযোগ্য হইয়াছে। প্রদর্শিত অধিকরণটী রামানুজের ভাষ্যে স্পষ্টাকারে বা মুখ্যরূপে অভিহিত হইয়াছে। অন্যান্য অবান্তর অধিকরণ বা খণ্ড খণ্ড বিচার তিনি পরমত খণ্ডন প্রসঙ্গে সমাধা করিয়াছেন। কীদৃশ মনুষ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মুখ্যাধিকারী? বেদান্তের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তু কি? বেদান্তের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ কিরূপ? ব্রহ্মজ্ঞান কি এবং তাহার ফলই বা কি? এই চার অনুবন্ধ (বেদান্ত বিচার-প্রবৃত্তির প্রয়োজক কারণ) নির্ণয় উপলক্ষ্যে রামানুজ স্বামীকে শঙ্কর ভাষ্যোক্ত পূর্ব্বপক্ষগুলিকে সিদ্ধান্ত পক্ষে গ্রহণ করিতে দেখা যায়। যথা—

১। যে ব্যক্তি জৈমিনিকৃত কর্ম্মমীমাংসায় ব্যুৎপন্ন, সেই ব্যক্তিই বাদরায়ণ

কৃত ব্রহ্মমীমাংসার মুখ্যাধিকারী।” ইহা শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষ। “সাধন চতুষ্টয় যুক্ত ব্যক্তিই বেদান্ত বিচারের মুখ্যাধিকারী, ইহা শঙ্করের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

“সাধনচতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মমীমাংসার উত্তমাধিকারী” ইহা রামানুজের পূর্ব্ব পক্ষ। “কর্ম্মমীমাংসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মমীমাংসায় অধিকারী” ইহা রামানুজের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

২। “ব্রহ্ম ও জীব পরমার্থত বিভিন্ন” ইহা শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষ। “ব্রহ্ম ও জীব পরমার্থত অভিন্ন” ইহা শঙ্করের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

“ব্রহ্ম ও জীব পরমার্থতঃ অভিন্ন” ইহা রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ। “ব্রহ্ম ও জীব বস্তুত বিভিন্ন” ইহা রামানুজের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

৩। “ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মাত্র অজ্ঞান নিবৃত্তি” ইহা শঙ্করের সিদ্ধান্তপক্ষ এবং ব্রহ্মের সমান হওয়া তাঁহার পূর্ব্ব পক্ষ।

“ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অজ্ঞান নিবৃত্তি” ইহা রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ এবং ব্রহ্মসমান হওয়া” রামানুজের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

৪। সম্বন্ধ—প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক এ অংশ উভয় মতে সমান।

এক অথ শব্দের দ্বারা ঐরূপ আরও অনেক বিচার উঠিয়াছে। তন্মধ্যে শঙ্করের অন্যতম সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার বিষয়, অধিকারী, ফল, সমস্তই ব্রহ্ম মীমাংসার বিষয়, অধিকারী, ও ফল হইতে অত্যন্ত পৃথক্। সে জন্য কর্ম্মমীমাংসার সহিত ব্রহ্মমীমাংসার ক্রমসম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বাপরীভাব নাই। পূর্ব্বাপরীভাব দূরে থাকুক, অধিকন্তু বাধ্যবাধক ভাব আছে। এই স্থানে রামানুজের সিদ্ধান্ত—পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা একই শাস্ত্র, পরন্তু তদ্দ্বারা ক্রমসম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বাপরীভাব আছে। আগে কর্ম্মমীমাংসায় ব্যুৎপন্ন হওয়া, পরে ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় মীমাংসার ফল বিভিন্ন বটে, পরন্তু তাহা অধিকারী ক্রমের ভেদ অনুসারে। অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মে না বলিয়া আগে ধর্ম্মমীমাংসার প্রয়োজন, পশ্চাৎ ব্রহ্মমীমাংসার আয়োজন। এইরূপ অধিকারক্রম অনুসারেই ফলভেদ দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উভয় মীমাংসারই লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। ইত্যাদি।

যেমন অথ শব্দের অর্থনির্ণয়ে নানা বিচার, তেমনি, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের নির্ণয়েও নানা বিচার উত্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞান সন্ প্রত্যয়ের অর্থ ইচ্ছা। মুমুক্ষু ব্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করিবেন, এইরূপ অক্ষরার্থ প্রতীতির পরে এইরূপ মর্ম্মার্থ প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির প্রধান উপায়। ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির উপায়, এ অংশে কাহারও মতভেদ নাই। কিরূপ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান? তাহা সূত্রে লিখিত না থাকায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শঙ্করের সিদ্ধান্ত—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শ্রবণজনিত অনির্ব্বিন্ন ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তির নাম ব্রহ্মজ্ঞান, তদুদয়ে অজ্ঞানের পলায়ন ও স্বস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ। বার বার মহাবাক্য শ্রবণ (বিচার) করিলেও যদি পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অসম্ভব বোধের অথবা বিপর্য্যয়-বোধের বাধায় অখণ্ড বা নির্বিশেষ ব্রহ্মাদ্বৈত বুদ্ধি উদিত না হয় তাহা হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেক, প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই অখণ্ড ব্রহ্মাকারাকারিতা

চিত্তবৃত্তি উদিত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত নাহংব্রহ্ম এই অনাদি অজ্ঞান বিদূরিত করিবেক।

শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত রামানুজের রুচিকর হয় নাই। রামানুজ ঐ সিদ্ধান্তকে পূর্ব্ব পক্ষে স্থাপন করিয়া "বাক্যজন্য জ্ঞান পরোক্ষ রূপেই উৎপন্ন হয়, প্রত্যক্ষাকারে উৎপন্ন হয় না" ইত্যাদি প্রকারে উহার খণ্ডন করিয়াছেন, পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধ্রুবা স্মৃতি নামক জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। ধ্রুবা শব্দের অর্থ নিশ্চল অথবা স্থায়ী। স্মৃতিশব্দের অর্থ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ। সাধক শাস্ত্রশ্রবণকালে যে ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়াছেন তল্লক্ষণান্বিত ব্রহ্মকে অধিকতর প্রগাঢ় রূপে স্মরণ করার নাম ধ্রুবা স্মৃতি। এই ধ্রুবা স্মৃতি কোথাও ধ্যান শব্দে, কোথাও উপাসনা শব্দে, কোথাও নিদিধ্যাসন শব্দে, কোথাও ব্রহ্মজ্ঞান শব্দে এবং কোথাও বা বেদন শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদন অর্থাৎ জানা। ধ্যান প্রগাঢ় বা পরিপক্ব হইলে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের সহিত সমান হইয়া পড়ে। এই ধ্রুবা স্মৃতি ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নামের নামী ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সাধন চতুষ্টয় নহে, সাধন সপ্তক বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ এই সাত সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলে জীব উক্তবিধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। বিবেকাদি শব্দের অর্থ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। বিবেক অর্থাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা। নিষিদ্ধ ভক্ষ্য বর্জ্জন এবং বিহিত ভক্ষ্য ভক্ষণ। আরও বিশদ কথা—সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ও সংশোধন যদ্দ্বারা হয় তাহাই ভক্ষণ করা।

২। বিমোক শব্দের অর্থ—ত্যাগ। ত্যাগের সীমা—কাম্য কামনা বা ভোগাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ।

৩। অভ্যাস শব্দের অর্থ—পুনঃ পুনঃ স্বায়ত্ত করা। অর্থাৎ অনবরত ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করা।

৪। ক্রিয়া শব্দের অর্থ—যথাশক্তি শাস্ত্রবিহিত নিত্য কর্ম্মাদি করা।

৫। কল্যাণ শব্দের অর্থ—সত্য, সারল্য দয়া, দান (লোভ পরিত্যাগ) অহিংসা ও বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ।

৬। অনবসাদ শব্দের অর্থ—শোকাদির দ্বারা অভিভূত না হওয়া।

৭। অনুদ্ধর্ষ শব্দের অর্থ—ইষ্ট লাভাদির দ্বারা অতিহৃষ্ট না হওয়া। *

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্ম কি তাহা বুঝাইবার জন্য একটী লক্ষণ বলিয়াছেন, এই প্রপঞ্চ (জগৎ) যাহা হইতে জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যাহাতে অবস্থিতি করিতেছে, এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা ব্রহ্ম। বাদরায়ণের ঐ কথায় ব্রহ্ম কিংস্বরূপ? সাকার কি নিরাকার? সগুণ কি নির্গুণ? দ্বৈত? কি অদ্বৈত? তাহা ঠিক্ বুঝা যায় না। শ্রুতি ও যুক্তি অবলম্বনে বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। কাজেই যিনি যেমন বুঝেন তিনি তেমনি বলেন, উপদেশ করেন। এ সম্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজ যে সকল বিচার করিয়াছেন, সে সকলের মধ্য হইতে কতিপয় প্রধান সিদ্ধান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১। ব্রহ্ম নিরাকার অর্থাৎ অমূর্ত্ত। প্রপঞ্চান্তর্গত প্রত্যেক মূর্ত্তের নাম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতি বাদ দিলে যে অনাকৃতি ও

* রামানুজের এই সাধন সপ্তক শঙ্করের সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে নিবিষ্ট আছে।

অব্যপদেশ্য অস্তিতা, প্রকাশিতা ও প্রিয়তা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। নাম ও আকৃতি অস্থায়ী ও আগন্তুক ও পরিবর্ত্তনশীল সেজন্য তাহা মিথ্যা। অবশিষ্ট নিত্য স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তন স্বভাব, সেজন্য তাহাই খাঁটী সত্য। নাম ও আকৃতি সসীম অর্থাৎ অল্পাধিক আকারে সীমাবদ্ধ। পরন্তু অবশিষ্ট সর্ব্বত্রানুভূত বলিয়া অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন। সুতরাং ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। সৎ চিৎ, আনন্দ, এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ করা হইল বটে, পরন্তু বস্তু একটী। যেমন দাহও অগ্নি, ঔষ্ণ্য ও অগ্নি, তাহার আলোকও অগ্নি, তেমনি সত্যও ব্রহ্ম, চৈতন্য বা প্রকাশও ব্রহ্ম, প্রিয়তা বা সুখও ব্রহ্ম। এই অমূর্ত্ত ব্রহ্ম মিথ্যাভূত মূর্ত্ত প্রপঞ্চের মূলে মধ্যে ও অবসানে সদা বিদ্যমান। সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ও আধার।

২। মূর্ত্ত প্রপঞ্চ বা দ্বৈত মায়িক, মায়িক বলিয়া মিথ্যা। যে আধারে মূর্ত্ত প্রপঞ্চ রজ্জু সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে সেই সর্ব্বাধার অমূর্ত্ত ব্রহ্মই পরম সত্য।

৩। জীবে যে অনুভূতি বিদ্যমানা, সেই অনুভূতি উপরের লিখিত সৎ চিৎ আনন্দের অব্যতিরিক্ত। তাহাই নিত্য নির্ব্বিকার নিরাকার নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ। উহা সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ বর্জ্জিত—অত্যন্ত নির্ব্বিভেদ পরম বস্তু।

৪। উক্ত অনুভূতিই মুখ্য আত্মা। অহং পদার্থ মুখ্য আত্মা নহে। যে জ্ঞান গুণ বলিয়া গণ্য, সে জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে।

৫। মুখ্য আত্মা ও পরব্রহ্ম একই বস্তু, সেজন্য উক্ত উভয়ের ঐক্য প্রমা (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) তদ্বিষয়ক অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের নাশক।

৬। অদ্বৈতই ঠিক্, দ্বৈত ইন্দ্রজালবৎ মায়িক। শ্রুতি দুই প্রকার থাকিলেও অদ্বৈত শ্রুতি প্রবলা এবং দ্বৈত শ্রুতি দুর্ব্বলা। দুর্ব্বল শ্রুতিকে প্রবলের অনুগামী করিয়া ব্যাখ্যা করা ন্যায়সিদ্ধ।

শঙ্করের এই সকল সিদ্ধান্ত রামানুজ ভাষ্যের পূর্ব্বপক্ষ। এ সম্বন্ধে যাহা রামানুজের সিদ্ধান্ত তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। ব্রহ্ম অত্যন্ত নিরাকার নহেন। তাঁহার প্রাকৃত আকার না থাকিলেও জ্ঞানানন্দাদিময় আকার আছে।

২। প্রপঞ্চও সত্য। যেহেতু প্রপঞ্চ ব্রহ্মোদ্ভব, সেই হেতু প্রপঞ্চ সত্য। যেমন সত্য মৃত্তিকায় মিথ্যা ঘট হয় না, তেমনি, সত্য ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিক মিথ্যা প্রপঞ্চ হয় না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব কথা আপেক্ষিক মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সমান সত্য নহে বলিয়াই শাস্ত্রে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বর্ণিত হয়। ঘট যেমন মৃত্তিকার সহিত সমান সত্য নহে, (সমস্থায়ী নহে), সেইরূপ, প্রপঞ্চও ব্রহ্মের সহিত সমান সত্য নহে।

৩। মায়ামাত্রেই যে মিথ্যা, তাহা নহে। শ্রুত্যুক্ত মায়া ভগবদিচ্ছারূপা, সে জন্য তাহা মিথ্যা নহে। সেজন্য তদুপাদানক প্রপঞ্চও মিথ্যা নহে।

৪। দ্বৈতাদ্বৈত শ্রুতির মধ্যে দ্বৈত শ্রুতিই প্রবলা, অদ্বৈত শ্রুতি দুর্ব্বলা। সুতরাং অদ্বৈত শ্রুতিগুলি দ্বৈতশ্রুতির অনুগুণে ব্যাখ্যেয়।

৫। নির্ব্বিশেষ বা অত্যন্ত নিগুর্ণ বস্তু অপ্রামাণিক। কোনও প্রমাণে উহা প্রমিত হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ,

সমুদায় প্রমাণ সবিশেষ পদার্থের গ্রাহক, নির্ব্বিশেষ পদার্থের গ্রাহক নহে। সেজন্য, বিশিষ্ট বস্তুই প্রামাণিক, নির্ব্বিশেষ বস্তু অপ্রামাণিক।

৬। সৎ ও অনুভূতি এক অর্থাৎ অভিন্ন নহে নির্বিশেষও নহে। অপিচ, অনুভূতি অনিত্য আগন্তুক, বিকারী, ও সবিশেষ।

৭। প্রোক্ত কারণে অনুভূতি আত্মা নহে। অহং পদার্থই আত্মা, অনুভূতি তাহার ধর্ম্ম। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি পরিবর্ত্তনশীল সমুদায় অবস্থায় অনুভূতির অনুবৃত্তি দেখা যায়, সুতরাং মোক্ষে অহং-এর অনুবৃত্তি থাকে। অতএব, অহং পদার্থই আত্মা, তদতিরিক্ত অনাত্মা।

লোকে জীব ব্রহ্মের ঐক্য হয় বটে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে বা সর্ব্বাকারে ঐক্য হয় না। স্বরূপ ঐক্য হয় না অর্থাৎ দুএ এক হইয়া যায় না।

আত্মা জ্ঞানরূপী বটে; জ্ঞান গুণও বটে।

১০। অদ্বৈতই তত্ত্ব, ইহা সত্য বটে; পরন্তু নির্ব্বিশেষ একাদ্বৈত শ্রুত্যভিপ্রেত নহে। অদ্বৈত দ্বিবিধ। প্রকারাদ্বৈত ও প্রকারী অদ্বৈত। ব্রহ্মাদ্বৈত ও জীবাদ্বৈত। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, এ কথার অর্থ—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ব্রহ্মান্তর ব্রহ্মের অধিক বা ব্রহ্মের সমান নাই। ইহা ভিন্ন তাহার প্রকারান্তর নাই, অর্থাৎ তিনি নিষ্প্রকার বা নির্ব্বিশেষ, এমন অর্থ নহে। "একঃ সন্ বহুধা বিচচার" অর্থাৎ তিনি একই ব্রহ্ম দেব মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি শরীরে বিরাজিত, এই শ্রুতির অর্থে স্থির হয় যে, তিনি এক বটেন, পরন্তু বহু প্রকারে ও অর্থাৎ বহু আধারে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বত্রই জ্ঞানাকারে বিরাজিত, আকারান্তরে নহে। অতএব, প্রকারগত ভেদ থাকিলেও প্রকারী ব্রহ্ম এক বা অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতকে প্রকারি অদ্বৈত বলা যায়। জীব অনেক, পরন্তু সর্ব্বত্র সকল জীব একই প্রকার সে জন্য অর্থাৎ এক প্রকারতা লক্ষ্য করিয়া জীবের উপরেও এক অদ্বিতীয় শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। এতদনুসারে, জীবের ঐ প্রকার অদ্বৈতকে প্রকারাদ্বৈত বলা যায়। *

ক্রমশঃ।

প্রার্থনা (৩)।

মাতৃ-স্নেহ।

কিবা স্নেহ ধরে মাতা। সুরূপ কুরূপ
দেখেনা মা সন্তানের। স্নেহ-ধন জানে
তারে। স্নেহ-চখে দেখে, অমিয় বচন
স্নেহ-মাখা বলে; স্নেহে লয়ে কোলে চাঁদ
মুখ চুম্বে। কতভাবে মা রোগিলে শিশু,
নীরোগিতে তারে কত করে প্রাণ পণে।
অবাধ্য শিশুরে রাখে মা নয়ন-আড়ে,
কি জানি অপথে যদি হারায় জীবন।
কি জানে অবোধ শিশু কি গৃহ-দেবতা
অদৃশ্যে যাচিয়ে ভাল বাসে তারে কত,
বিঘ্ন-কাঁটা গায়ে তার না লাগে আঁচড়,
স্নেহের আড়ালে লয়ে হেন রাখে তারে।
উপমিব তব স্নেহ মাতৃ-স্নেহ সনে
জগৎ-জননি! হেরি তব স্নেহ-কণা
মায়ের হৃদয়ে, স্পর্দ্ধা মনে উপমিতে
নিরুপমে! কি জানিব আমি অভাজন মূঢ়
স্নেহের মূরতি তব, কত সুধা তায়!
সম্পদ, বিপদ, সব স্নেহে দাও তুমি।
গরল সন্তানে কভু না দেয় জননী।

---

* এই অদ্বৈততত্ত্ব স্থানান্তরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবেক।

নির্ব্বতে সন্তানে দীপ নিবায় মা স্নেহে,
নিবাইয়া সুখ-দীপ তেমতি জননি!
দুখের আঁধারে লয়ে নিবারি কুটিল
কামনা, কু-আশা মোহ পোষিছ পরাণ।
তারিবে অধমে কি মা সংসার সঙ্কটে?
দয়া করি দাও চখে জ্ঞানের অঞ্জন,
দেখি বিষয়ের পথ শুধু তমোময়,
ত্যজি তাহা—যাই তব অমৃতের পথে।
কৃপা করি ক্ষম মাগো করেছি যে পাপ,
পাইতেছি যার তারে কত মনস্তাপ,
হায়রে আগেতে যদি সঁপিতাম প্রাণ,
দেহ সরবস্ব মোর তোমার চরণে,
তাহ'লে তোমার কাজ করিতাম কত,
জীবন হইত মোর কত মধুময়,
পরাণ দহিছে-কত সুযোগ ছাড়িনু।
মোহ আলস্যের বশে বিষয়ে ডুবিনু,
দয়া করি বলিবে কি মরণ সময়,
"গণিব না আমি তোর পাপ সমুদয়,"
তবে ত সুখের মম হইবে মরণ।
তবে ত পাইব আমি তব শ্রীচরণ॥

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

২৪শ প্রস্তাব।

যুদ্ধকাণ্ড।

কুম্ভকর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাবণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! মৃত্যুকাল উপস্থিত, বলশালী রাম সুগ্রীব সাহায্যে আমাদের মূলোচ্ছেদ করিতেছে। তুমি বানর সৈন্য সহিত রাম লক্ষ্মণের বিনাশ সাধন কর। কুম্ভকর্ণ কহিল রামচন্দ্র পরমপুরুষ নারায়ণ, সীতা যোগমায়া, ইহা আমি মহর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি, তুমি বৈরীভাব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের ভজনা কর। তচ্ছ্রবণে দশগ্রীব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কুম্ভকর্ণও নিরুপায় হইয়া রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অসীম বীরত্ব দেখাইয়া পরিশেষে জীবন বিসর্জ্জন দিল। নারদও ইত্যবসরে গগনমণ্ডল হইতে রাম-সকাশে অবতীর্ণ হইয়া নারায়ণবোধে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রামের সহিত যুদ্ধকরণ মানসে রাবণের অনুমতি লইয়া দৈবকার্য্য সাধনার্থ নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের মন্ত্রণাবলে যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিয়া যে কিরূপে তাঁহার বিনাশ সাধন করেন, তাহা আমরা মূল রামায়ণ হইতে দেখাইয়াছি। পরিশেষে রাবণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশ মতে রণে অজেয় হইবার জন্য নির্জ্জনে হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিভীষণ দূর হইতে হোমধূম অবলোকনে ভীত হইয়া রামকে কহিলেন আপনি অচিরাৎ হোম-বিঘ্ন উৎপাদন করুন।

হনূমান অঙ্গদাদি তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল। বিভীষণ-ভার্য্যা সরমার ইঙ্গিত মতে হোমস্থানের নির্দ্দেশ পাইয়া তাহারা গুহা-মুখস্থিত পাষাণ পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, রাবণ মুদ্রিত-নয়নে দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট। বানরগণ তদ্দর্শনে হব্যসামগ্রী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, হনুমান রাবণের হস্ত হইতে স্রুব কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা রাক্ষসরাজকে প্রহার করিল। কেহবা দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা রাবণকে আঘাত করিতে লাগিল। রাবণ তথাপি বিজিগীষাবশতঃ ধ্যান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অঙ্গদ রাবণের ধ্যানভঙ্গ মানসে অন্তঃপুর হইতে রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে কেশমুষ্টি ধারণে রাবণের সম্মুখে আনয়ন করিল ও বিবিধ

বিধানে তাঁহার অবমাননা করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ প্রাণসমা পত্নীর আর্ত্তনাদে আর বধির থাকিতে পারিলেন না। হোম পড়িয়া থাকিল, তিনি উঠিয়া পড়িলেন, বানরগণও তথা হইতে পলায়ন করিয়া রামপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণ মন্দোদরীকে সান্ত্বনা-দানে উদ্যত হইলে মন্দোদরী দুঃখিতভাবে কহিলেন, দেখ তুমি বা অপরে রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না; রাম সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, এখনও যুদ্ধকামনা পরিত্যাগ কর, বিদেহনন্দিনীকে রামসমীপে প্রেরণ করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিয়া আমাকে লইয়া অরণ্যে চল। রাবণ কহিলেন, পুত্রহীন ভ্রাতৃহীন রাক্ষসমণ্ডলবিহীন হইয়া জীবন ধারণে ফল কি? আমি রাম ও সীতাকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী জানিয়াই বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। মুমুক্ষুগণ যে নির্ম্মল পরমানন্দময় স্থান লাভ করেন, আমি রামের হস্তে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই সেই স্থানই প্রাপ্ত হইব।

রাবণ রণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তালতরু হইতে যেরূপ ফলরাজি নিপতিত হয়, রাবণের বহুতর মস্তক রক্তাক্ত হইয়া সেরূপ পতিত হইয়াও আবার উঠিতে লাগিল। ফলতঃ রাবণের কবন্ধ কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। রাম বিভীষণের নির্দ্দেশে আগ্নেয় অস্ত্রে রাবণের নাভিদেশ বিদ্ধ করিলেন। রাবণ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া একমাত্র মস্তক ও দুই বাহু দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। রামও নিশ্বসন্ত সর্পের ন্যায় এক প্রদীপ্ত শর ধনুকে যোজনা করিয়া তাহা অতিবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মর্ম্মঘাতী ভীষণ অস্ত্র রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসরাজ গতজীবন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বেগে ভূতলে নিপতিত হইলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবতাগণ দেখিলেন সূর্য্যতুল্য ভাস্বরজ্যোতিঃ রাবণের দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া রঘুবরে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা কহিলেন অহো! রাবণের কি সৌভাগ্য! আমরা সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণ, তথাপি আমাদের ভয় দুঃখ শোকাদি আছে, আমরা ঈশ্বরের স্নেহের সামগ্রী, তথাপি আমাদিগকেও সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। *

বয়ং তু সাত্ত্বিকা দেবা বিষ্ণোঃ কারুণ্যভাজনাঃ,
ভয়দুঃখাদিভির্ব্যাপ্তাঃ সংসারে পরিবর্ত্তিনঃ।

৮০ শ্লো। ১১ অঃ।

কিন্তু এই রাক্ষস ক্রূর, ব্রহ্মঘাতী, অতীব তমোগুণসম্পন্ন, পরস্ত্রীতে আসক্ত, তথাপি সে সাক্ষাৎ নারায়ণ রামচন্দ্রে প্রবিষ্ট হইল। নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাবণ সর্ব্বদা রামের প্রতি দ্বেষ বশতঃ ভৃত্যগণের সহিত নিরন্তর দ্বেষভাবে রামচরিত শ্রবণ করিত, রামের হস্তে আপনার নিধন জানিয়া ভয়ে সর্ব্বত্র রামকে দেখিতে পাইত, প্রত্যহ রামকে স্বপ্ন দেখিত; রামের প্রতি রাবণের ক্রোধ গুরূপদেশ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইয়াছিল। রাবণ রামহস্তে বিনষ্ট হইয়া বিধৌতপাপ ও বন্ধনমুক্ত হইয়া রামসাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। এই বলিয়াই সুললিত ছন্দে বলিলেন

পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধনপরদারেষু সক্তো যদি স্যা-
ন্নিত্যং স্নেহাৎ ভয়াদ্বা রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেত।

---

* দেবতাগণও যে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত নহেন, তাঁহাদিগকেও যে লোক পরিভ্রমণ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতামত পাঠকগণ আমাদের প্রকাশিত "পরলোক ও মুক্তি" নামক পুস্তকে দেখিতে পারেন।

লেখক।

ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশতজনিতানেকদোষৈ র্বিমুক্তঃ
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্
৮৬। ৮৭ শ্লো। ১১ শ অধ্যায়।

ভয় বশতই হউক, আর স্নেহ বশতই হউক, যে, যে অবস্থায় যে ভাবে কেন ঈশ্বরের নাম করুক না সে সদ্য মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই যেন সমগ্র অধ্যাত্মরামায়ণের শেষ মীমাংসা। অধ্যাত্মরামায়ণকার যেন ইহাই পরিচ্ছিন্ন ভাবে বিবৃত করিতে গিয়াই এই ধর্ম্মগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন দেখ রাবণ কখন রামচন্দ্রকে প্রেমের চক্ষে দেখিল না। তাঁহার ভাই, বন্ধু স্ত্রী সকলেই তাঁহাকে রামের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই বিফল হইল। রাবণ কিছুতেই রামের সীতাকে ফিরাইয়া দিলেন না। অবশেষে নিজেই বিনষ্ট হইলেন।

বৈরীভাবেও ঈশ্বরের নাম লইলে যে মুক্তিলাভ হয়, এ কথাটি বড়ই মধুর, বড়ই আশাপ্রদ। আমরা মোটামুটি যেরূপ দেখিতে পাই তাহাতে অর্থী ও বিপন্ন লোকেই ঈশ্বরের নাম করে, নিরবচ্ছিন্ন তাঁহাকেই লাভ করিব এই উদ্দেশে তাঁহার পথের পথিকের সংখ্যা জগতে বড়ই বিরল। অধ্যাত্মরামায়ণকার দেখাইতে চাহেন যে শুদ্ধ অর্থী ও বিপন্ন কেন, রাবণ বা মিল্‌টনের প্যারাডাইজলষ্টের সয়তানের মত মহাপাপী, যাহারা ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্য ছারখার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, যাহারা ঘৃণার চক্ষে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহাদের মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে ভগবানের নাম বাহির হইলে তাহারাও মৃত্যুঅন্তে মুক্তি লাভের অধিকারী।

এদেশের মধ্যযুগের অর্থাৎ পৌরাণিক কালের শাস্ত্রকারগণের সমস্ত মনোযোগ কেবল ইতর সাধারণের (Mass) মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই যেন ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহাদের বড় আশঙ্কা ছিল যেন সাধারণে উন্নততম ধর্ম্ম বা সাধন-লভ্য ঈশ্বর ধরিতে না পারিয়া নাস্তিক হইয়া না যায়। ফলত তাঁহাদিগকে অজ্ঞানান্ধ লোক লইয়াই বেশী নাড়াচাড়া করিতে হইত। তাই তাঁহারা অভয়বাণী রাখিয়া গিয়াছেন যে স্নেহ বা ভয়ে ঈশ্বরের নাম লও, বৈরীভাবে বা প্রেমের চক্ষে তাঁহাকে দেখ, তোমাদের সকলেরই মুক্তি সুনিশ্চিত। বলিতে কি ইহা শুনিয়া পাপী পুণ্যবান সকলেরই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। যিনি দয়ারূপিণী পরমমাতা তাঁহার দয়ার গভীরতাই এইরূপ বটে!

এক্ষণে কথা হইতেছে মুক্তি কি এতই সহজগম্য। অধ্যাত্মরামায়ণকার মুক্তি লাভ কি এতই সহজ বোধ করেন। যাঁহারা অধ্যাত্মরামায়ন নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কেহই একথা বলিতে সাহস করিবেন না। শাস্ত্রকার নিজ পুস্তকে বহুল স্থলে ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের কথা এতই বিবৃত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন এবং তৎসমস্ত এতই মধুর এতই জ্ঞানপূর্ণ যে তাহা অন্যান্য গ্রন্থে বড়ই বিরল।

তবে অনেকে বলিতে পারেন যে, বৈরীভাবে ঈশ্বরের নাম লইলে যদি মুক্তি হয়, একবারমাত্র গঙ্গাস্নানে যদি শুদ্ধ নিজে কেন ত্রিকোটি কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যায়, বারেক তীর্থ ভ্রমণে যদি মৃত্যু অন্তে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আর কঠোর-সাধ্য ধর্ম্মের সাধনার আবশ্যকতা কোথায় রহিল, মুক্তিরই বা গুরুত্ব কোথায় গেল। হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক সামান্য

শুভ কার্য্যের পুরস্কার মুক্তি হইলে, লোকে যে যুগযুগান্ত ধরিয়া মুক্তি লাভের জন্য হাহাকার করিতেছে, তাহাদের নিষ্কারণ ক্রন্দন বাতুলতা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে আমাদের উত্তর এই যে মধ্যযুগে দেশের ঘোর অজ্ঞানতার অবস্থায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সময়ে আমাদের দেশের শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণ মুক্তিদানে যে বাস্তবিকই কল্পতরু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের অধিকার বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে গেলে ধর্ম্মের পুরস্কার সম্বন্ধে এরূপ উন্নত আশা ধারণ এক প্রকার অনিবার্য্য। জ্ঞানোন্নত সময়ে সত্যধর্ম্মের প্রকৃত বিকাশের অবস্থায় ধর্ম্ম নিষ্কাম, কিন্তু যখন ধর্ম্ম ম্লান ভাব ধারণ করে, জনসমাজ মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার খর্ব্বতা হইয়া আইসে, তখন সে দেশে সে অবস্থায় ধর্ম্ম সকাম না হইয়া থাকিতে পারে না। এবং এই শেষোক্ত অবস্থায় শাস্ত্রকারগণকেও লোকসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য ধর্ম্মের পুরস্কার সম্বন্ধে কল্পতরু না হইলে চলে না। তাই এদেশের দুর্গোৎসব অশ্বমেধফলপ্রদ, গঙ্গাস্নান মুক্তিপ্রদ, তীর্থদর্শন মোক্ষপ্রদ, বৈরীভাবে সাধন ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রদ, স্ত্রীলোকের ব্রতনিয়মাদি অশেষ কাম্যবিষয়প্রদ। এবং এখানে ইহাও স্বীকার্য্য—যে এই সকল কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে পুরস্কারলাভের আশা এত বিপ্লবের মধ্যেও এদেশের নরনারীকে আজও সমধিক পরিমাণে ধর্ম্মের সহিত দৃঢ়যুক্ত রাখিয়াছে। তাই বলিয়া জ্ঞানী সাধকের নিকটে মুক্তিও কিছু সহজগম্য নহে, এবং তাহার সাধনাও কিছু সহজ নহে।

আজ কাল লোকে প্রতি কথায় ছল ধরিতে চাহে। এক সময় ছিল লোকে নিম্ন-অধিকারীর সাধন ও বিশ্বাস লইয়া বিদ্রুপ করিতে সাহসী হইত না, এবং প্রবৃত্তিও ছিল না। গীতাকারও বলিয়া গিয়াছেন যাহারা অবিবেকী তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহারা স্থূল বুদ্ধিতে যাহা করিতেছে করিতে দাও। নিষ্কারণ তাহাদের অন্তরে সংশয়ের বীজ রোপণ করিও না, কেন না উহার অবশ্যম্ভাবী ফল নাস্তিকতা। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময় সে কথা টেঁকিতে পারে না। বহুকালের বদ্ধভাবের পর স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইলে তাহার পরিনাম সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

সে যাহা হউক রাবণ বিনষ্ট হইলে বিভীষণ রাবণরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হনুমান কর্ত্তৃক সীতা শিবিকাযোগে আনীত হইলে সেই মায়াসীতাকে অবলোকন করিয়া রাম তাঁহাকে অবক্তব্য কটু বাক্য কহিতে লাগিলেন। সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে অগ্নি জ্বালিতে বলিলেন ; অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সীতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন দিব্যভূষণে অলঙ্কৃতা জনক-তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া রঘুবরকে কহিলেন, প্রভু! দশাননের প্রাণ-বিনাশের জন্য মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বে বনে যাঁহাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, এই সেই (প্রকৃত) দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন। রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সেই প্রতিবিম্বরূপিণী সীতা এক্ষণে অন্তর্হিতা হইয়াছেন। অনন্তর রাম আনন্দ সহকারে সেই সীতাকে গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও রামের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিভীষণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে রাম

অযোধ্যা-নগরী যাইতে উৎসুক হইলেন। বিভীষণ অঙ্গদ হনুমানাদি তাঁহার পুষ্পক রথের সহযাত্রী হইল। অযোধ্যায় পেঁৗছিলে রামের রাজ্যাভিষেক বৃত্তান্তে নূতনত্ব কিছুই নাই। রাম দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে প্রজাবর্গের সুখের ইয়ত্তা ছিল না। এই খানেই লঙ্কাকাণ্ড শেষ হইল।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে রামের সর্ব্বজ্ঞত্ব বজায় রাখিতে গিয়া মায়াসীতা কল্পনায় ও তাঁহার অগ্নিপরীক্ষাদিতে পাঠকের কাব্যঘটিত ঔৎসুক্য বিনষ্ট হইয়াছে, কবিত্বের দারুণ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বাল্মীকি এই এই স্থলে যে রচনাকৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই জগতে অতুলনীয় ও তজ্জনিত কাব্য-জগতে তাঁহার সিংহাসন এতই মহিমান্বিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম রামায়ণকার একস্থানে বলিয়াছেন যে ঈশ্বর নিরাকার হইলেও জগৎ পালনেচ্ছা বশত তাঁহার দুই দেহ, বিরাট শরীর—স্থূল দেহ এবং হিরণ্যগর্ভ—সূক্ষ্ম দেহ। এই সমস্ত সহস্র সহস্র অবতার বিরাট দেহেরই হইয়া থাকে, আবার প্রয়োজন সিদ্ধি হইলেই ঐ সকল অবতার-দেহ বিরাট-দেহেই প্রবিষ্ট হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে, রাবণবধের জন্য ত রামের জন্ম; রাবণবধ ত হইয়া গেল; তাঁহার আবার মনুষ্যরাজ্যে প্রয়োজন কি? যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ক্ষণ মধ্যে ত্রিলোক বিনষ্ট হয়, তাঁহার পক্ষে মনুষ্যরাজ্য কতটুকু জিনিস! শাস্ত্রকারের উত্তর এই ভক্তগণের মনোরথ পূরণেচ্ছায় লীলামনুষ্যশরীরে সকল ব্যবহার অনুসারেই তিনি চলিয়া থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায়ে আছে রাম রাজা হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে পরমাত্মা তাঁহার আবার যজ্ঞ কি? শাস্ত্রকারের উত্তর এই যে সমস্তই লোকশিক্ষার্থ।

এইরূপে শাস্ত্রকার যতদূর পারিয়াছেন, রামের অবতারত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই অভিষ্টসিদ্ধির জন্য রামের ঐতিহাসিক জীবনও আবশ্যকমত অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি, যদি বাল্মীকি রামায়ণের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে না হয় রামের অবতারত্ব একদিন বজায় থাকিত। আমরা যতদূর দেখাইয়াছি, তাহাতে যুক্তি ও ইতিহাস উভয়েই রামের অবতারত্বের বিরোধী। আগামী বারে সমগ্র উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুরাকালের বিবাহ।

এক সময়ে এই ভারতে পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনে পিতা জাতিকুলের সমাদর না করিয়া একমাত্র গুণেরই যে বিশেষ গৌরব করিত, রাজাধিরাজের পুত্র প্রার্থী হইলেও কন্যার পিতা কেমন অকুণ্ঠিতভাবে পাত্রের পদমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া তদীয় দেহ মনের নানা রূপ শক্তি পরীক্ষা করিত, বুদ্ধের বিবাহে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। এক্ষণে আমরা পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে সেই অংশ নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বুদ্ধদেব অল্প বয়সেই সংসার-বিরাগী। রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে সং-

সারাসক্ত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেন কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। একদা মনে করিলেন পুত্র স্ত্রীগণপরিবৃত থাকিলে আর সংসারত্যাগের কামনা করিবেন না। এই চিন্তা করিয়া শাক্যবংশীয় বৃদ্ধগণ দ্বারা তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। শুনিয়া বুদ্ধ মনে করিলেন, কামই সমস্ত শোক দুঃখের মূল, উহা অসিধারা তুল্য ও জ্বলনসন্নিভ। উহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আবার ইহাও ভাবিলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরা স্ত্রীপুত্রপরিবৃত হইয়াও ধ্যানভ্রষ্ট হন নাই, যাহা হউক পিতার অনুরোধে আমি তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিব।

এই স্থির করিয়া কহিলেন, আমি বিবাহে সম্মত আছি, কিন্তু পিতা যাঁহাকে আমার বধূরূপে বরণ করিবেন তাঁহার সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ হওয়া চাই, প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার ঈর্ষাদি দোষ থাকিলে চলিবে না। তিনি সুরূপা হইবেন কিন্তু তাঁহার রূপগর্ব্ব যেন কিছুমাত্র না থাকে। তিনি মাতা ও ভগিনীর ন্যায় স্নেহবতী হইবেন, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে যথাসামর্থ্য দান করিয়া স্বধনে নিত্য সন্তুষ্ট থাকিবেন। শঠতা ও কপটতা দোষ তাঁহার যেন না থাকে। তিনি স্বীয় ভর্ত্তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বপ্নেও পরপুরুষ কামনা করিবেন না। সদা সংযত ও অপ্রমত্ত হইবেন। তাঁহার পানদোষ যেন না থাকে। আর যিনি সত্যে স্থিত, ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্যরহিত, লজ্জাশীল ও ধর্ম্মনিরত সেইরূপ বধূই আমার জন্য মনোনীত করুন। যিনি কায়মনো বাক্যে আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ, যিনি মানমূঢ় নহেন, এবং শ্বশ্রু ও শ্বশুরের প্রতি ভক্তিপরায়ণা, দাসদাসীর প্রতি যাঁহার আত্মবৎ প্রেম, যিনি সর্ব্বশেষে শয়ন ও সর্ব্বাগ্রে উত্থান করিতে সমর্থ 'তাং তাদৃশীং মম বধূং বরয়স্ব তাত' সেইরূপ বধূই আমার জন্য মনোনীত করুন।

শুদ্ধোদন লোকমুখে পুত্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণকে কহিলেন আমার পুত্র বিবাহে সম্মত, তিনি বধূর কুলার্থী বা গোত্রার্থী নহেন কেবল গুণার্থী। তাঁহার দৃষ্টি কেবল বধূর গুণ সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি। অতএব তুমি কপিলবস্তু নগরে রাজকুমারের জন্য কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কি শূদ্র যে বর্ণেই হউক এইরূপ রূপবতী ও গুণবতী কন্যা অনুসন্ধান করিয়া সত্বর আমাকে সংবাদ দেও।

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়।
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।

অনন্তর পুরোহিত, রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে কপিলবস্তু নগরের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান পূর্ব্বক একস্থলে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা দেখিতে পাইলেন। তিনি নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা নাতিস্থূলা নাতিকৃশা নাতিগৌরী নাতিকৃষ্ণা এবং নবযৌবন সম্পন্না। ঐ কন্যা পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনি কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছেন। পুরোহিত কহিলেন রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সুরূপ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনি বিবাহার্থী, যে কন্যা সর্ব্বগুণসম্পন্না হইবেন তিনি তাঁহাকেই পত্নীত্বে বরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে গাথা রচনা করিয়া দিয়াছেন এই লও, তুমি ইহা পাঠ কর। তখন ঐ কন্যা পুরোহিতের হস্ত হইতে গাথা লেখ্য লইয়া সস্মিত মুখে আদ্যো-

পান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমাতে এই সমস্ত গুণ আছে। অতএব সেই স্বরূপ যুবা আমারই পতি হউন। এক্ষণে আপনি তাঁহাকে গিয়া বলুন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, হীন প্রাকৃত লোকের সহিত আমার সংযোগ না হৌক। তিনিই আমার ভর্ত্তা হউন।

ভণহি কুমারু যদি কার্য্য মা বিলম্ব
মা হীনপ্রাকৃতজনেন ভবেয় বাসঃ।

পরে পুরোহিত, রাজা শুদ্ধোদনের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া শুদ্ধোদন ভাবিলেন এখন কুমার স্বয়ংই স্বচক্ষে দেখিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করুন। ইহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ব্যাপার সহজে সম্পাদিত হইবার জন্য আমি অশোকভাণ্ড সকল প্রস্তুত করাইতেছি। কুমার স্বয়ংই স্বহস্তে এই সমস্ত ভাণ্ড কন্যাগণকে বিতরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে যিনি সর্ব্বাংশে তাঁহার নয়নানন্দদায়িনী হইবেন আমি সেই কন্যাকেই তাঁহার জন্য মনোনীত করিব।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন নানারত্নময় অশোকভাণ্ড সকল প্রস্তুত করাইলেন, এবং কপিলবস্তু নগরে এইরূপ ঘণ্টাঘোষণা করিয়া দিলেন, রাজকুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে দর্শন দিবেন এবং স্বহস্তেই কন্যাদিগকে অশোকভাণ্ড সকল দান করিবেন। অতএব ঐ দিবস সংস্থাগারে কন্যাদিগের উপস্থিতি আবশ্যক।

পরে সপ্তম দিবসে রাজকুমার সংস্থাগারে গিয়া এক রত্নখচিত সুশোভন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই অবসরে নগরের যাবতীয় কন্যা তাঁহাকে দর্শন এবং অশোকভাণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য ঐ সংস্থাগারে আসিতে লাগিল। কুমার একে একে সকলকেই অশোকভাণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এমনই পবিত্র জ্যোতি এমনই অলৌকিক প্রভাব যে উহাদের মধ্যে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অশোকভাণ্ড লইয়া সত্বরই তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ইতিপূর্ব্বে রাজনিয়োগে পুরোহিত যে কন্যাকে মনোনীত করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি শাক্যবংশীয় দণ্ডপাণির কন্যা,নাম গোপা। সুরূপা গোপা দাসীগণপরিবৃতা হইয়া যথায় রাজকুমার উপবিষ্ট সেইস্থানে একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে ছিলেন। যখন বিতরণ প্রসঙ্গে সমস্ত অশোকভাণ্ড নিঃশেষিত হইয়াছে তিনি সেই সময়ে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া সস্মিত মুখে কহিলেন, কুমার, আমি এমন কি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার অবমাননা করিলে। রাজকুমার কহিলেন না, আমি তোমার অবমাননা করি নাই। এখন অশোকভাণ্ড সমস্তই নিঃশেষিত এবং তুমিও সর্ব্বশেষে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি স্বহস্ত হইতে বহুমূল্য এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া উহাঁকে অর্পণ করিলেন। কন্যা কহিলেন রাজকুমার তোমার নিকট আমি এইরূপই প্রার্থনা করি। এই বলিয়া অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পরে রাজা শুদ্ধোদন প্রচ্ছন্নচারী পুরুষের দ্বারা স্বপুত্রের শাক্যকন্যা গোপার প্রতি প্রীতি সঞ্চার হইয়াছে শুনিয়া কন্যার পিতা দণ্ডপাণির নিকট পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন তোমার কন্যাকে আমার পুত্রে অর্পণ কর। শুনিয়া দণ্ডপাণি কহিলেন, আর্য্য, রাজকুমার কেবল ভোগসুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন।

সারাসক্ত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেন কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। একদা মনে করিলেন পুত্র স্ত্রীগণপরিবৃত থাকিলে আর সংসারত্যাগের কামনা করিবেন না। এই চিন্তা করিয়া শাক্যবংশীয় বৃদ্ধগণ দ্বারা তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। শুনিয়া বুদ্ধ মনে করিলেন, কামই সমস্ত শোক দুঃখের মূল, উহা অসিধারা তুল্য ও জ্বলনসন্নিভ। উহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আবার ইহাও ভাবিলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরা স্ত্রীপুত্রপরিবৃত হইয়াও ধ্যানভ্রষ্ট হন নাই, যাহা হউক পিতার অনুরোধে আমি তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিব।

এই স্থির করিয়া কহিলেন, আমি বিবাহে সম্মত আছি, কিন্তু পিতা যাঁহাকে আমার বধূরূপে বরণ করিবেন তাঁহার সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ হওয়া চাই, প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার ঈর্ষাদি দোষ থাকিলে চলিবে না। তিনি সুরূপা হইবেন কিন্তু তাঁহার রূপগর্ব্ব যেন কিছুমাত্র না থাকে। তিনি মাতা ও ভগিনীর ন্যায় স্নেহবতী হইবেন, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে যথাসামর্থ্য দান করিয়া স্বধনে নিত্য সন্তুষ্ট থাকিবেন। শঠতা ও কপটতা দোষ তাঁহার যেন না থাকে। তিনি স্বীয় ভর্ত্তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বপ্নেও পরপুরুষ কামনা করিবেন না। সদা সংযত ও অপ্রমত্ত হইবেন। তাঁহার পানদোষ যেন না থাকে। আর যিনি সত্যে স্থিত, ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্যরহিত, লজ্জাশীল ও ধর্ম্মনিরত সেইরূপ বধূই আমার জন্য মনোনীত করুন। যিনি কায়মনো বাক্যে আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ, যিনি মানমূঢ় নহেন, এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের প্রতি ভক্তিপরায়ণা, দাসদাসীর প্রতি যাঁহার আত্মবৎ প্রেম, যিনি সর্ব্বশেষে শয়ন ও সর্ব্বাগ্রে উত্থান করিতে সমর্থ 'তাং তাদৃশীং মম বধূং বরয়স্ব তাত' সেইরূপ বধূই আমার জন্য মনোনীত করুন।

শুদ্ধোদন লোকমুখে পুত্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণকে কহিলেন আমার পুত্র বিবাহে সম্মত, তিনি বধূর কুলার্থী বা গোত্রার্থী নহেন কেবল গুণার্থী। তাঁহার দৃষ্টি কেবল বধূর গুণ সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি। অতএব তুমি কপিলবস্তু নগরে রাজকুমারের জন্য কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কি শূদ্র যে বর্ণেই হউক এইরূপ রূপবতী ও গুণবতী কন্যা অনুসন্ধান করিয়া সত্বর আমাকে সংবাদ দেও।

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়।
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।

অনন্তর পুরোহিত, রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে কপিলবস্তু নগরের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান পূর্ব্বক একস্থলে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা দেখিতে পাইলেন। তিনি নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা নাতিস্থূলা নাতিকৃশা নাতিগৌরী নাতিকৃষ্ণা এবং নবযৌবন সম্পন্না। ঐ কন্যা পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনি কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছেন। পুরোহিত কহিলেন রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সুরূপ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনি বিবাহার্থী, যে কন্যা সর্ব্বগুণসম্পন্না হইবেন তিনি তাঁহাকেই পত্নীত্বে বরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে গাথা রচনা করিয়া দিয়াছেন এই লও, তুমি ইহা পাঠ কর। তখন ঐ কন্যা পুরোহিতের হস্ত হইতে গাথা লেখ্য লইয়া সস্মিত মুখে আদ্যো-

পাণ্ড সমস্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমাতে এই সমস্ত গুণ আছে। অতএব সেই স্বরূপ যুবা আমারই পতি হউন। এক্ষণে আপনি তাঁহাকে গিয়া বলুন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, হীন প্রাকৃত লোকের সহিত আমার সংযোগ না হোক। তিনিই আমার ভর্ত্তা হউন।

ভণহি কুমারু যদি কার্য্য মা বিলম্ব
মা হীন প্রাকৃতজনেন ভবেয় বাসঃ।

পরে পুরোহিত, রাজা শুদ্ধোদনের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া শুদ্ধোদন ভাবিলেন এখন কুমার স্বয়ংই স্বচক্ষে দেখিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করুন। ইহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ব্যাপার সহজে সম্পাদিত হইবার জন্য আমি অশোকভাণ্ড সকল প্রস্তুত করাইতেছি। কুমার স্বয়ংই স্বহস্তে এই সমস্ত ভাণ্ড কন্যাগণকে বিতরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে যিনি সর্ব্বাংশে তাঁহার নয়নানন্দদায়িনী হইবেন আমি সেই কন্যাকেই তাঁহার জন্য মনোনীত করিব।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন নানারত্নময় অশোকভাণ্ড সকল প্রস্তুত করাইলেন, এবং কপিলবস্তু নগরে এইরূপ ঘণ্টাঘোষণা করিয়া দিলেন, রাজকুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে দর্শন দিবেন এবং স্বহস্তেই কন্যাদিগকে অশোকভাণ্ড সকল দান করিবেন। অতএব ঐ দিবস সংস্থাগারে কন্যাদিগের উপস্থিতি আবশ্যক।

পরে সপ্তম দিবসে রাজকুমার সংস্থাগারে গিয়া এক রত্নখচিত সুশোভন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই অবসরে নগরের যাবতীয় কন্যা তাঁহাকে দর্শন এবং অশোকভাণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য ঐ সংস্থাগারে আসিতে লাগিল। কুমার একে একে সকলকেই অশোকভাণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এমনই পবিত্র জ্যোতি এমনই অলৌকিক প্রভাব যে উহাদের মধ্যে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অশোকভাণ্ড লইয়া সত্বরই তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ইতিপূর্ব্বে রাজনিয়োগে পুরোহিত যে কন্যাকে মনোনীত করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি শাক্যবংশীয় দণ্ডপাণির কন্যা,নাম গোপা। সুরূপা গোপা দাসীগণপরিবৃতা হইয়া যথায় রাজকুমার উপবিষ্ট সেইস্থানে একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে ছিলেন। যখন বিতরণ প্রসঙ্গে সমস্ত অশোকভাণ্ড নিঃশেষিত হইয়াছে তিনি সেই সময়ে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া সস্মিত মুখে কহিলেন, কুমার, [illegible]মি এখন কি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার অবমাননা করিলে। রাজকুমার কহিলেন না, আমি তোমার অবমাননা করি নাই। এখন অশোকভাণ্ড সমস্তই নিঃশেষিত এবং তুমিও সর্ব্বশেষে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি স্বহস্ত হইতে বহুমূল্য এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া উহাঁকে অর্পণ করিলেন। কন্যা কহিলেন রাজকুমার তোমার নিকট আমি এইরূপই প্রার্থনা করি। এই বলিয়া অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পরে রাজা শুদ্ধোদন প্রচ্ছন্নচারী পুরুষের দ্বারা স্বপুত্রের শাক্যকন্যা গোপার প্রতি প্রীতি সঞ্চার হইয়াছে শুনিয়া কন্যার পিতা দণ্ডপাণির নিকট পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন তোমার কন্যাকে আমার পুত্রে অর্পণ কর। শুনিয়া দণ্ডপাণি কহিলেন, আর্য্য, রাজকুমার কেবল ভোগসুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন।

কিন্তু শিল্পজ্ঞকে কন্যাদান করা আমাদের কুলধর্ম্ম। রাজকুমার কোনও রূপ শিল্প জানেন না এবং যুদ্ধবিদ্যাতেও নিপুণ নহেন। অতএব রাজাকে বলিবেন উক্ত রূপ গুণসম্পন্ন পাত্র না পাইলে আমি কদাচ কন্যা দান করিব না।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৬৬৸/৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	২৬৪৫ ৶/৩
সমষ্টি	...	২৮১১৸৶/৬
ব্যয়	..	২৮ /০
স্থিত	...	২৭৮৩৸৵/৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲	
দক্ষে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	২০০০৲	
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৵/৩	
	২১৩৮৵/৩	
		২৬৩৮৵/৩
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু		৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত		১৩৮৸৩
		২৭৮৩৸৵/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	৩৪৷৵/০

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ	২৪৲
পুরাতন সংবাদ পত্র বিক্রয়ের মূল্য	৷৵/০
	৩৪৷৵/০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৮৷/০

৺ বাবু জয়গোপাল সেন,	কলিকাতা	১৲
„ „ যদুলাল মল্লিক,	ঐ	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র দত্ত,	ঐ	৩৲
„ „ হেমলাল পাইন,	ঐ	৩৲
„ „ জানকীনাথ মজুমদার,	ঐ	৩৲
„ „ বনমালী চন্দ্র,	ঐ	৩৲
„ „ বলাইচাঁদ পাইন,	ঐ	৩৲
„ „ কন্নুলাল বর্ম্মন,	ঐ	৩৲
„ „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ,	ঐ	৩৲
„ „ আশুতোষ ধর,	ঐ	৩৲
„ „ ব্রজনাথ দত্ত,	ঐ	৩৲
„ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী,	ঐ	১৲
„ „ কুঞ্জবিহারী দেব,	ঐ	১৲
„ „ ক্ষেত্রমোহন ধর,	ঐ	২৲
„ „ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	ঐ	৩৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে,	ঐ	১৲
„ „ গোবিন্দলাল দাস,	ঐ	৩৲
„ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	ঐ	৩৲
„ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর,	ঐ	৩৲
„ মহারাজা বাহাদুর অব্ দিনাজপুর		৩৷৵০
„ পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি,	কোন্নগর	৶০
„ বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত,	ঢাকা	৮৲
		৫৮৷/০

পুস্তকালয়	...	৪৷৶/৬
গচ্ছিত	...	৬৮৷৵/৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৷০
সমষ্টি		১৬৬৸/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৩ /৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৩৷৶/৩
পুস্তকালয়	...	।/৬
যন্ত্রালয়	...	১৶/৯
সমষ্টি		২৮/০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫৪
৬৫৩ সংখ্যা

১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ভূমিকম্পে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ভগ্নপ্রায় হওয়ায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবের বাটীতে সাপ্তাহিক উপাসনা হইতেছিল। এক্ষণে গৃহের সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় এই স্থানেই উপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

অষ্টষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!

১১ই মাঘের শুভ উৎসব দিনে তোমরা সকলে সংযম অবলম্বন করিও এবং আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিও। এই উৎসবের দিনে আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সংযম পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে থাকাই প্রকৃষ্ট বিধি। তোমরা এইরূপ বিধি অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মোৎসবের পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে।

শান্তিনিকেতনে সপ্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৬৮ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

রাত্রিপ্রভাতে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সুমধুর

ভজন গীতে প্রবুদ্ধ হইলাম। গৃহের বাহির হইয়া দেখি নির্ম্মল সুশীতল বায়ু বহিতেছে। নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষশাখায় মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। রাত্রিশেষের অস্ফুট চন্দ্রালোকে কুজ্ঝটিকাবৃত দিগন্তের দ্রাঘিমা অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ দুই একটী ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্র। বড়ই রমণীয় সময়। আমরা কিয়ৎক্ষণ পাদচার প্রসঙ্গে প্রাভাতিক শোভা উপভোগ করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অরুণরাগ জল স্থল ব্যোম রঞ্জিত করিয়া তুলিল। আমরা প্রাতঃস্নানাদি করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ধূপধুনার সুগন্ধ সকলের মন পুলকিত করিয়া তুলিল। আমরা সমবেত হইয়া 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দন গীতি গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তিভরে সমস্বরে 'দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান' এই প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন নিম্নোক্ত রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"অদ্যকার এই উৎসব কোলাহলে আমরা যেন ইহা বিস্মৃত না হই যে,সাধক শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন। এইরূপ সুন্দর নিভৃত নির্জ্জন প্রদেশেই—চতুর্দ্দিকে ওষধি বনস্পতি পুষ্পিত কানন এবং সুদূর প্রান্তর—উপরে অনন্ত আকাশ মঙ্গল লোক হইতে মঙ্গল লোকে প্রসারিত—এইরূপ দেবসেব্য মনোরম স্থানেই সাধকেরা শান্তদান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন—যাঁহার দর্শনে অন্তঃকরণ হইতে পাপ মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়া গিয়া সুনির্ম্মলা শান্তির উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকে। অতএব এই উৎসব ক্ষেত্রে যাঁহারা সমাগত হইয়াছেন তাঁহারা একান্ত মনে পরমাত্মার প্রতি মনঃসমাধান করুন—যিনি সত্যের সত্য মঙ্গলের মঙ্গল আত্মার আত্মা সংসার সাগরের একমাত্র ভেলা—সর্ব্বজগতের পিতা মাতা এবং সুহৃৎ সেই মহান্ পুরুষের প্রতি মনকে স্থিরভাবে নিবিষ্ট করুন এবং তাঁহার আনন্দরস পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে বিষাদ কলহ এবং অশান্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করুন—একদিনের জন্য এইরূপ করুন তাহা হইলে কেহই এখান হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইবেন না—পরম পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রতিজনের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া তাঁহাদের সকল দুঃখ নিবারণ করিবে; করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রসাদ বারি বিতরণ করুন।"

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বাভিপ্রায় এইরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন।

"যিনি মহতো মহীয়ান আমরা ক্ষুদ্র হইয়া তাঁর কথা কি বলিব। জানি না তাঁর কথা কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায়াই বা শেষ করিব। আমাদের বাক্য সম্পূর্ণই নিস্তব্ধ। এতক্ষণ যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া কৃতার্থ হইলাম তাহা ভারতের প্রাচীন ঋষিবাক্যে। যাঁহারা ধ্যানযোগে তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন এতক্ষণ আমরা যে সেই সকল ঋষিদিগের জ্বলন্ত নিশ্বাসে আপনাদের নিশ্বাস মিশাইতে

পারিলাম ইহাতেই আমরা ধন্য। এখানে আমরা নিজের কথা কিছু বলিতে আসি নাই এ বিষয়ে আমরা বস্তুতই দুর্ব্বল। এক্ষণে যে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব তাহাও ঋষিবাক্যে। যিনি এই নির্জ্জন প্রশান্ত তপোবনে ভগবচ্চিন্তায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন, যাঁর কৃপায় এই ভারত আবার ব্রহ্মনামে জাগ্রত হইয়াছে, যাঁর এই মহতী কীর্ত্তি তাঁরই অগ্নিময় মহাবাক্যে। ঋষিবাক্য প্রাচীন হইলেও চিরনূতন। সকলে ভক্তিসহকারে অবহিত হইয়া শুন এতকাল যাহা পাও নাই ইহাতে তাহাই মিলিবে।"

পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এই উপদেশ দিলেন।

"যাহা কিছু সান্ত তাহা ঈশ্বর নহে, যাহা দেশে কালে পরিচ্ছিন্ন তাহা ঈশ্বর নহে, যিনি জ্ঞানে প্রেমে সদ্ভাবে সসীম তিনি ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর অনন্ত অগম্য, অপার অসীম। এই ত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। কিন্তু কে সেই অনন্ত দেবকে বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে; কয়জনেই বা তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পায়? এই যে অনন্ত আকাশ পরিধিরূপে আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, এই যে অগণ্য তারকাখচিত নীলিমা চন্দ্রাতপের ন্যায় দিগদিগন্তে প্রসারিত রহিয়াছে, এই যে তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ছুটিতেছে, কেই বা তাহাদের অসীম ব্যাপকতা সম্বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচনা করে, কেই বা তাহাদের অবলম্বনে সেই অনন্ত দেবকে ধরিতে প্রয়াসী হয়।

এই খানেই তোমার আমার সহিত প্রকৃত সাধকের প্রভেদ। আমি হয়ত দূরবীক্ষণ যোগে আকাশবিহারী গ্রহ-উপগ্রহের দূরত্ব স্থির করিব, নক্ষত্রাবলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইব, পরিমাপক রজ্জুতে সমুদ্রের অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য ও তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার পরিমাণ করিব। আমার বহির্ম্মুখী জ্ঞানের ধারাই এই। কিন্তু এই সকল অনন্তের ছায়া যাহা আমার সম্মুখে বিরাজমান, জ্ঞানোন্নত সাধক কেবল তাহাদেরই সাহায্যে আপনার অন্তশ্চক্ষুকে সমুজ্জ্বল করেন, এবং সেই সমুজ্জ্বল দৃষ্টি-প্রভাবে সেই অনন্তদেবকে সন্দর্শন করিবার উপযুক্ত হয়েন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্ফুলিঙ্গ কোথা হইতে বিনির্গত হইল, যদি দেখিতে চাও আমার সঙ্গে আইস। ঐ দেখ মহাত্মা রামমোহন রায় তরুণ বয়সে হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, অভ্রভেদী উন্নততম চূড়ার উপরে তাঁহার দৃষ্টি সম্বদ্ধ; ভয়ে বিস্ময়ে তটস্থ হইয়া বলিতেছেন, যিনি হিমাচলসমন্বিত সমগ্র জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা তিনি অসীম অনন্ত দেব—মৃত্তিকা-ধাতু-প্রস্তরমূর্ত্তি নহেন—তিনি অমূর্ত্ত অশরীরী।

আবার কোন বিরাট হৃদয়ের সাধনার বলে সেই বিস্ফুলিঙ্গ—নিষ্কলঙ্ক স্থায়ী তেজোরাশি রূপে জগতের সমক্ষে আবির্ভূত হইল, তাহাও যদি জানিতে চাও, তবে সেই ঋষিজীবনের সামান্য পরিচয় দিব।

বহুকাল ধরিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনা-ক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতনে থাকিয়া বিশাল প্রান্তরের সহিত হৃদয়ের তার মিলাইতেন। তাই সপ্তচ্ছদতলস্থ ঐ প্রস্তর বেদী উদ্যানকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রান্তরের কূলে সংস্থাপিত! পরিপুষ্ট বৃক্ষরাজিসমন্বিত এই উদ্যানের পশ্চিমোত্তরে বৃক্ষের এত অল্পতা কেন,

তাহার কি সন্ধান রাখিয়াছ? মহর্ষি চিরকালই "সূর্য্যের অস্তমিত মহিমা" সন্দর্শনের পক্ষপাতী। যখন এই অংশের তরুলতা বিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি অবরোধ করিল, তিনি তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ করিলেন। তিনি নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া কেন এই বিজন প্রান্তরে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন? তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, লোকের কথা নিবৃত্তি না পাইলে, ঈশ্বরের বাণী মনুষ্যের কর্ণে আসিয়া পৌঁছে না। উদাস প্রান্তরের ভিতরে প্রাচীর-বিহীন এই স্বচ্ছ মন্দির কেন বিনির্ম্মিত হইল? তিনি উপলব্ধি করিলেন, যে এইরূপ প্রান্তরের বিশালতাকে চক্ষের উপর ধরিয়া মুক্ত-হৃদয়ে মুক্ত-কণ্ঠে মুক্ত-স্থানে বসিয়া তাঁহার আরাধনা না করিলে সে উপাসনা তাঁহার চরণতল স্পর্শ করে না। লৌহ-প্রস্তরে কেন এই উপাসনামণ্ডপ গ্রথিত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মনুষ্যের ব্যাকুলতা ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর উপাদান আর কোথায় পাইবে। যতদিন শরীরে বল ছিল, তিনি সেই অনন্তদেবের সন্ধানে পর্ব্বত-পাথার গহন-কান্তার ঘুরিয়াছেন, এখনও সেই শ্রান্ত-দেহ প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্যের উদীয়মান রক্তচ্ছবি অনুরাগভরে প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে অবলোকন করে। বর্ত্তমানে একভাবে ইহাও তাঁহার সাধনার এক অঙ্গ।

আমরাত সকলেই ব্রাহ্ম। কিন্তু দীক্ষার দিন কে কবে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ত বর্ষগ্রন্থি জন্মতিথির হাস্যোল্লাসে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সাধকের ভাব অন্যরূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই দিনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাই জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার অন্তে মুক্তির পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইয়া, পরীক্ষালব্ধ সত্য ধর্ম্ম ও সাধনালব্ধ ঈশ্বরের সাক্ষীস্বরূপ এই মন্দির এইখানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সাধকের হৃদয়—তাঁহাদের কার্য্য বিশ্লেষণ কর, সেখানে এমন কিছু দেখিবে, যাহাতে বাস্তবিকই তুমি স্তম্ভিত হইয়া যাইবে; এবং আপনার দুর্ব্বলতা দেখিয়া ততই মর্ম্মাহত হইবে। আমরাও যে সংসার ছাড়িয়া বৎসরান্তে দুই একদিনের জন্য এই বিশাল প্রান্তরে আসিয়া মিলিত হই, তাহা হইলে আমাদিগকেও "নিতান্ত রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে না। বলিতে কি সেই অনন্তদেবের পূজার্চ্চনার জন্য এরূপ অনুকূল তীর্থভূমি বড়ই বিরল।

পরমাত্মন্! ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির অনুরূপ এই বিশাল প্রান্তরে আসিয়া আজ তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি, তুমি আমাদের সমক্ষে আবির্ভূত হও। বৈরাগ্যের কবচে আবৃত হইয়া আজ তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। দীনভাবে তোমার নিকট ক্রন্দন করিতেছি, তুমি নিজ হস্তে আমাদের অশ্রুজল মার্জ্জনা কর। অনন্যগতি হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমি তোমার উদার-ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দাও। মুমুক্ষু হইয়া তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তুমি আমাদের বাসনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিম্নোক্তরূপ প্রার্থনা করিলেন।

"হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে

আত্মা দিয়াছ, বল দিয়াছ, তোমারই কৃপা বলে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব কার্য্যে সক্ষম রহিয়াছে, তোমারই কৃপাবলে আমাদের মননশক্তি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তোমাকে অবলম্বন করিলেই আমরা অমৃতধামের—সেই শান্তিনিকেতনের অধিকারী হইতে পারি, তোমা হইতে বিচ্যুত হইলেই আমরা সংসারপ্রবাহে ভাসমান হইতে থাকি, অতএব তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকে আত্ম সমর্পণ করিব? হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমাদের সকলের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাতে লয় পায়, যাহাতে আমাদের সকলের বুদ্ধি তোমার প্রিয় কার্য্যে নিয়োজিত হয়, যাহাতে আমাদের সকলের মন তোমাতেই সংযুক্ত থাকে, সেই শুভ আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রেরণ কর। আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার কার্য্যে অনুগত নয়, আমাদের ইচ্ছা সকল তোমার ইচ্ছার অনুকূল নয়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল সংসারের নীচ সংকীর্ণ ভাব সকল পোষণ করিতেছে, তাই আমরা প্রতিদিন নীচতা হইতে নীচতাকে প্রাপ্ত হইয়া রোগ-শোক পাপতাপ বিবাদ বিসম্বাদ দ্বারা সংসারকে অশান্তিময় করিয়া তুলিতেছি। পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, দেব মনুষ্য ওষধি বনস্পতি সূর্য্য চন্দ্র বায়ু প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ তোমার নিয়মে অটল থাকিয়া যেমন নির্ব্বিঘ্নে আপনার আপনার কার্য্য করিতেছে, আমাদের সকলের ইচ্ছা যদি সেইরূপ তোমার ধর্ম্ম-কার্য্যে সতত পরত রত থাকিত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে কি এত অসামঞ্জস্য, এত অমঙ্গল, এত দুঃখ দারিদ্র আসুরিক কার্য্য সকল স্থান পাইত? হে পরমাত্মন্! দিব্যধামবাসী দেবতারা যেমন একমনা হইয়া তোমার ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছেন, এই পৃথিবীতেও যেন সেইরূপ আমরা তোমার ইচ্ছায় যোগদান করি, তাহা হইলে স্বর্গের ন্যায় এই পৃথিবীও শান্তিনিকেতনে পরিণত হইবে। আমরা তোমাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া কেবল কতকগুলি নীচ মলিন বাসনা লইয়া আছি, কামনার উপভোগই জীবনের একমাত্র পুরুষার্থ মনে করিয়া ধনমান বিষয় বিভবের জন্য লালায়িত হইয়া বিব্রত রহিয়াছি। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, ধর্ম্ম হউক, অধর্ম্ম হউক, লোকের হিত হউক বা অহিত হউক—কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে আমাদের স্বার্থ সাধন হয় আমরা তাহাতেও প্রস্তুত তথাপি তোমার প্রতি লক্ষ্য করি না। সেই জন্য আমরা এই সংসারেই এত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমরা নীচ মলিন কামনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকে লাভ করিবার অধিকারী হই, আমাদিগকে সেই প্রকারে বলীয়ান কর। ব্রহ্মানুভূতি না থাকিলে আমাদের মধ্যে প্রকৃত সহানুভূতি জন্মাইতে পারে না। ব্রহ্মানুভূতির অভাবেই আমরা পরস্পর একমন একপ্রাণ হইতে পারিতেছি না। ব্রহ্মানুভূতির নিকট রাগদ্বেষ ঈর্ষা লোভ মোহ প্রভৃতি অনিষ্টকারী বৃত্তি সকল স্থান পায় না—ব্রহ্মানুভূতির সহিতই শান্তি বিরাজিত। অতএব হে পরমাত্মন্! আমরা একমন ও একপ্রাণ হইয়া তোমার নিকট করযোড়ে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া শান্তি উপভোগ করিতে পারি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রেরণ কর। যাহাতে আমরা তোমার ইচ্ছার অনুগত হই ও এই পৃথিবী যাহাতে

শান্তিনিকেতনে পরিণত হয় বারম্বার এই প্রার্থনা করি। ওঁ সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।”

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য সমস্তক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর আমরা সকলে মিলিয়া মহর্ষিদেবের সাধনস্থান সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইলাম এবং তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত বেদির পার্শ্বে সকলে দণ্ডায়মান হইল খোল-করতাল-যোগে মধুর ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রৈলোক্য বাবু একটী সংক্ষিপ্তরূপ প্রার্থনা করিয়া মধুর স্বরে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গাহিলেন।

মিশ্র মল্লার—ঝাঁপতাল।

ওহে শান্তিদাতা,
স্থান দাও শান্তিনিকেতনে।
পাপভার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পথিক জনে।
ভবদাবানলে প্রাণ, দহিতেছে অবিরাম,
কর পিতা শান্তি দান শান্তিবারি বরষণে।
স্নান করি শান্তিজলে, নিবারে বাসনানলে,
বসি শান্তি তরুতলে নিরখিব নিরঞ্জনে;
পাসরিব পাপ তাপ, বিরহ শোক বিলাপ,
হব পরিতৃপ্ত তব দরশনে পরশনে।
এ বিজন বনবাসে, অনন্তের সহবাসে,
ভাসিতেন মহোল্লাসে মহর্ষি আনন্দ মনে;
নাহি হেথা কোলাহল, শান্তিময় জল স্থল,
বহে শান্তি পরিমল সুবিমল সমীরণে।
শান্তিরস পান করি, গাই আজ প্রাণ ভরি,
শান্তি শান্তি শান্তি হরি মিলে সব বন্ধুগণে।

ঐ সপ্তপর্ণ বেদির নিকটে একটী তোরণাকার প্রস্তরফলকে ‘শান্তং শিবমদ্বৈতং’ খোদিত। কল্পনার চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দেখিলাম যাঁহার সাধনার জন্য ঐ মর্ম্মরবেদি নির্ম্মিত সেই প্রশান্তস্বভাব মহাপুরুষ যেন তথায় ধ্যানমগ্ন। তিনি ধ্যানভঙ্গে চক্ষু উন্মীলন করিয়া মস্তকোপরি প্রসারিত অনন্ত আকাশে এবং সম্মুখে বলয়াকার বনচ্ছায়ায় নীলবর্ণ সুবিস্তীর্ণ দিগন্তে ভূমা ঈশ্বরের মহান ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর অন্তরে যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতংরূপে বিরাজমান ঐ বাহ্য প্রস্তরফলকে তাঁহারই সেই স্বরূপ এক একবার পাঠ করিতেছেন। ফলতঃ স্থানটী দেখিয়া মন বড়ই উৎফুল্ল হইল। ঐ উদ্যানভূমির মধ্যে সর্ব্বাংশে সাধনের অনুকূল এমন নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রদেশ আর নাই। পরে ইতস্তত আরও দেখিলাম এক একটী স্তম্ভোপরি কোথাও বেদমন্ত্রের একাংশ, কোথাও ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্পাংশ লিখিত। উদ্যানের অনেক স্থানে বৃক্ষমূলে সাধনবেদি এবং স্তম্ভোপরি লিখিত সাধন-সঙ্গীত। কাচময় মন্দিরের সম্মুখে একটী পুষ্করিণী আছে। তাহার মধ্যস্থলে একটী ধারাযন্ত্র মুক্তধারায় অনবরত জল উদ্গার করিতেছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে বসিবার নানারূপ সুশোভন মঞ্চ, নানা-জাতীয় বিকশিত পুষ্পবৃক্ষ এবং স্তম্ভে স্তম্ভে হৃদয়াকর্ষক বৈরাগ্যসূচক নানারূপ সঙ্গীত। উহারই অদূরে সুদৃশ্য এক সাধনশৈল আছে। তাহার শিখরদেশে এক সুরচিত সমবৃত্ত পর্ণকুটীর, একটী ঘনচ্ছায় বংশীবট প্রকাণ্ড দুই শাখাবাহু দ্বারা আবৃত করিয়া যেন বাত বর্ষা প্রভৃতি নানারূপ উৎপাত হইতে উহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। আহা কি সুস্নিগ্ধ ছায়া। তথায় সতত নির্বাধ সুনির্মল বায়ু বহমান, বৃক্ষে নানা জাতীয় পক্ষীর কলরব, কোথাও ময়ূর চন্দ্রকখচিত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা হরিণ, যে

দিকে চাও প্রকাণ্ড মাঠ ও আকাশ ধূধূ করিতেছে। ঐ শৈলের পাদমূলে একটা সুগভীর খাদ। উহা বর্ষার জলে পূর্ণ হইলে বড়ই সুশোভন হয়। ফলত এই স্থানটী প্রকৃত সাধকের যথার্থই প্রীতিকর।

অনন্তর আমরা মাধ্যাহ্নিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে এক ভিখারিণী বেহালার সুরে কোমল কণ্ঠ মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত গানটী গাহিতে লাগিল।

ভেবে মরি কি সম্পর্ক তোমার সনে।
তত্ত্ব তার তত্ত্বাতীত হে,না পাই বেদ পুরাণে॥
তুমি জনক নও জননী, ভাই নও ভগিনী,
আত্মবন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যে,
তোমায় এ নহে, সম্ভব একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।
শাস্ত্রে শুনতে পাই আছ সর্ব্ব ঠাঁই
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে।
তুমি হবে কেউ আমার, আপনার হতে
আপনার,আপনার না হলে মন কি টানে।

শুনিয়া বুঝিলাম স্থানমাহাত্ম্যে একটা সামান্য ভিখারিণীর গীতও আমাদের ভাবস্ফূর্ত্তির সম্পূর্ণ অনুকূল।

উদ্যানের বাহিরে নানাবিধ দোকান পসার আসিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। কোথাও বালকেরা পুত্তলী ক্রয় করিবার জন্য মাতার অঞ্চল ধরিয়া টানা টানি করিতেছে। কোথাও নানারূপ সুশোভন কৃত্রিম ফলপুষ্প। দেখিলে বয়স্কেরও লইবার লোভ হয়। দলে দলে চীবরধারী বলিষ্ঠ সাঁওতাল পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর ও বামহস্তে ধনুঃকাণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছে। কোথাও ভদ্র লোকেরা শোভন পরিচ্ছদে সেই বিপুল জনসমর্দ্দ মধ্যে বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্যাদির শিল্পচাতুরী দেখিতেছেন। ফলতঃ আমরা সেকাল একালের এরূপ অদ্ভুত সংমিশ্রণ আর কুত্রাপি দেখি নাই। ঐ সময় অতি দূর দেশাগত বাউলের দেহাত্ম সংক্রান্ত সঙ্গীত আরম্ভ হইল। বড়ই ক্ষোভ হইতেছে এমন সুভাবপূর্ণ সঙ্গীতের একটাও পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। এই সঙ্গীত শুনিয়া কি বিদ্বান কি মূর্খ সকলে সমভাবে আর্দ্রহৃদয় হইয়াছিলেন। যখন বাউলের দল গীতাবসানকালে ভাবে বিভোর হইয়া ঘন ঘন তুরীধ্বনির সহিত নৃত্য করিতে করিতে উদ্যান প্রদক্ষিণ করে তৎকালের দৃশ্য অতি বিস্ময়কর। উহাদের সহিত তথাকার ভদ্র লোকেরাও ভাবাবেশে উন্মত্ত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। সে কি আনন্দ! কি উচ্ছ্বাস! আমরা কখন তাহা বিস্মৃত হইব না। এই সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে ত্রৈলোক্য বাবু এবং ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণা বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা খোল করতাল ও একতারা যোগে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধুর ও কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতে মোহিত না হইয়াছিল এমন লোক অতি বিরল।

চতুর্দ্দিকে খুব জনতা। উৎসব দর্শনের জন্য চারদিক হইতে লোক সমাগম হইতেছে। কি উৎসাহ! কি ঘোর কলরব! ক্রমে রক্তচ্ছবি সূর্য্য অস্তমিত হইল। সুপ্রশস্ত কাচময়-গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে মঠাধ্যক্ষ স্বামী জী সাধকের মন পুলকিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য। এ সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্যই বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত ইহকালে কি পরকালে কখন বিচ্ছেদ হইবে না। অনন্তকালই আমরা তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিব। চিরকালই তাঁহার বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিব, ইহাই আমাদের প্রতি তাঁহার মঙ্গল বিধান। তাবৎ জগৎ সংসার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ের অধীন। কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অনুগামী প্রবৃত্তি সকলেরই পশ্চাতে থাকিয়া বিষয়সুখেই প্রমত্ত, যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখ প্রাপ্ত হইয়াই আপনাদিগের অতুল মহত্ত্ব কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা না জানিয়াই আপনাদের পরলোকের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র এখানকার ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী সাধু মহর্ষিগণ ইহাঁদেরই মুক্তির জন্য, ইহাঁদেরই পথের অন্ধকার দূর করিবার জন্য কত প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, কত প্রকারে আত্মত্যাগ ও বিষয় বাসনার খর্ব্ব করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন স্তম্ভিত হয়। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে না, এই শান্তিনিকেতনই তাহার এক অভূতপূর্ব্ব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে সাধু মহর্ষি এই পতিত বঙ্গদেশের উদ্ধারের জন্য উদ্যানের পুষ্পস্বরূপ, বৃক্ষের ফল স্বরূপ এবং ধর্ম্মের সারস্বরূপ ব্রহ্মোপাসনা ঘোষণা করিবার জন্য এই ৭ পৌষ দিনে সর্ব্বকল্যাণকর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারই তপস্যা ও পুণ্যপ্রভাবে এই নরমুণ্ড ও কঙ্কালাচ্ছাদিত শ্মশানভূমি এক্ষণে পুণ্যতীর্থ ও ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র ক্ষেত্র হইয়াছে। এখানে এখন নিত্য ব্রহ্মোপাসনা ও সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদিত হইয়া সকল মনুষ্যকে এই অনিত্য সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া সেই নিত্যসুখময় ধামের দিকে লইয়া যাইতেছে। অদ্য ৭ পৌষ, এখানকার মহোৎসবের দিন। আমরা এখন এখানে ব্রহ্মোপাসনার জন্য সকলে সমবেত হইয়াছি। এস, আমরা আমাদের সকল বিষয়কামনা, সকল পাপ, সকল সংশয়-অন্ধকার এই ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হই এবং সেই শুভসঙ্কল্প পরমেশ্বরের শুভ অভিপ্রায় সাধন করিয়া আপ্তকাম হই এবং তাঁহার ভক্তের সকল পরিশ্রম সার্থক করি।"

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ হইলে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত উপদেশ দিলেন।

"স্বভাবমেকে কবযো বদন্তি কালন্তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।

এই গ্রহ এই উপগ্রহ এবং এই পৃথিবীর পশু পক্ষী মানব নদী গিরি সমন্বিত সৃষ্টিকে কেহ কেহ স্বভাব বলিয়া ব্যক্ত করেন। কেহ বা মূঢ়তা বশতঃ ইহাকে কালেরই প্রভাব বলেন। কিন্তু ধ্যানযোগানুগত সত্যদর্শী ঋষির মহাবাক্য এই যে পরম দেবতারই এই মহিমা যিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সুশোভন দৃশ্য জগৎ দর্শন করিয়া যদি কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারে তো তাহার কারণ ইহা নহে যে ঈশ্বর আমাদের কাহারো নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। জানা উচিত যে বাহিরের যে কোন বস্তু আমাদের যতই

নিকটে থাকুক না কেন ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদের অধিকতর নিকটে রহিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য বস্তুতে আসক্ত ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে মহা মোহে মুগ্ধ করিয়া ভগবান হইতে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় সমস্ত বিশ্ব যাঁহার ক্রোড়ে শায়িত রহিয়া তাঁহার অমৃত পানে জীবন ধারণ করিতেছে সেই পরম মাতা আমাদের কত আপনার তাহা অনুভব কর। যেখানে গভীর ঔদাস্য, নিবিড় অন্ধকার, সেখানেও তিনি জাগ্রত ও দীপ্যমান রহিয়াছেন। তিনি যেমন দুঃখ ক্রন্দনের মধ্যে থাকিয়া শান্তি বিধান করেনও অন্ধকারে দীপ্যমান থাকেন সেইরূপ এই আলোকমালার মধ্যেও প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছেন। তিনি মলয় সমীরণে থাকিয়া আনন্দ প্রবাহিত করেন। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রের মধ্যে থাকিয়া শক্তি সঞ্চালন করেন এবং পুষ্পের মধ্যে থাকিয়া তাহাতে সুন্দর বর্ণ বিধান করেন; আবার সেই পুষ্পের গন্ধের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহার মধুর ভাবে জগৎকে মুগ্ধ করেন। তিনি স্বীয় কল্যাণময় ভাবে জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্যেরা এরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও সর্ব্বতঃপ্রাপ্য পরমেশ্বরকে একবারও স্মরণ করে না। তং সং প্রশ্নং ভুবনা যান্ত্যন্যাঃ। সকল বিশ্ব সেই এক পরমেশ্বরেরই প্রশ্ন করিতেছে, তাঁহারই পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত করিবার জন্য চেতন জীবগণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে কিন্তু আমাদের এ প্রকার জড়স্বভাব যে আমরা তাহাতে বধির ও অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। ঈশ্বর আমাদের চতুর্দ্দিকে আছেন, আমাদের অন্তরে আছেন, কিন্তু আমরা আমাদের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি, স্বীয় আত্মাকে দর্শন করি না এবং তাহাতে সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠানকে অনুভব করি না। জ্যোতির জ্যোতি, সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস, পুরাণ, অনাদি অনন্ত ও সকল জীবের জীবন তিনি। যাঁহারা আপনাদিগের অন্তরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করিয়া, তত্ত্ববিৎদিগের উপদেশে কর্ণপাত করিয়া আপনাদিগের অন্তরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করে। এই সংসারের যে সকল আপাতমনোরম বস্তু তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহারা আমাদিগের মনকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়ীর মন ক্ষণকালের নিমিত্ত বিষয় হইতে বিরত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবার অবসর পায় না। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি কিন্তু তাঁহাকেই ভুলিয়া জীবন যাপন করিতেছি, এ কি সামান্য কৃতঘ্নতা! ঋষিরাই যথার্থ বুঝিয়াছিলেন যে,

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব হইলে জীবন অপদার্থ হয়, জগৎ শূন্য হয়। এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প, ক্ষুয়মান স্রোত, ভঙ্গুর প্রাসাদ—ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান ধাতুর রাশি, উচ্চ পর্ব্বত, প্রসারিত সমুদ্র, অরণ্য ও প্রান্তর আমাদিগের মনে প্রতীত হয় বটে, তাহারা আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে বটে,

আমরা তাহাদিগকে সুখদায়ক বস্তু মনে করি বটে, কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে, তাহারা আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে তাহা তিনি তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগকে প্রদান করেন। রজনীর চন্দ্রমা, মধ্যাহ্নের দীপ্তিমান সূর্য্য, কাননের পুষ্প প্রভৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে তাহা সেই সুন্দর পরমেশ্বরেরই সৌন্দর্য্য। এই সকল সুন্দর বস্তু আপনাদিগের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিকে এরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা সেই পরম সুন্দর পুরুষের পদতলে উত্তীর্ণ হইতে পারি না। তিনি এরূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে তিনি ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন, এই নিমিত্ত যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কেহ কেহ এমনও আছে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। এই সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলেন যে,

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ"।

সেই ব্যক্তি নিতান্তই অসৎ হয় যদি সে ঈশ্বর নাই এইরূপ মনে করে। আপাততঃ প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর যে সকল পদার্থ তাহাতেই যাহারা আসক্ত হয় তাহারা কি দুর্ভাগা! তাহারা সত্যকে ছায়া ও ছায়াকে সত্য জ্ঞান করে। হায়! যাহা কিছুই নহে তাহাই কি আমাদের সর্ব্বস্ব হইবে, এবং যাহা আমাদের সর্ব্বস্ব তাহা কি আমাদের নিকট কিছুই নহে? এই মরীচিকাবৎ বৃথা ও শূন্য পদার্থ-সকল অধঃস্থায়ী আমাদের এই অধম মনেরই উপযুক্ত। ব্রহ্মপরায়ণ ধীর ব্যক্তি সকল বস্তুতেই ঈশ্বরকে প্রকাশমান দেখেন—সকল ঘটনার সংযোগে সেই মহান্ ঈশ্বরের কল্যাণ ইচ্ছাই সংযুক্ত দেখেন। যে মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরের পুণ্যজ্যোতি তাঁহাদের দিব্য চক্ষু হইতে তিরোহিত হয় তখনই কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠেন,

"নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে"।

হে ঈশ্বর, তোমা হইতে দূরে থাকিয়া প্রাণ আর কিছুতেই ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু এই মনুষ্যজন্মগ্রহণ করিয়া যে তাঁহাকে দেখিল না সে কিছুই দেখিল না। তাঁহাতে যাহার আস্বাদ নাই সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পাইল না। তাহার জীবন স্বপ্নস্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী ঈশ্বরের জ্ঞানের অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রামস্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা যে তাঁহাকে অনুসন্ধান করে, যে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী যাহার প্রতি ঈশ্বরের মুখজ্যোতি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাঁহারই প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তাঁহাকে পাইয়া আপ্তকাম হইয়াছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব এই রূপে প্রার্থনা করিলেন।

"সূর্য্য অদ্য প্রাতে অমৃতের অধিকারিগণকে অমৃতোৎসবের মধ্যে জাগ্রত করিয়া এবং অর্দ্ধ পৃথিবীকে কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক অবশেষে আমাদের এই আশ্রম-প্রান্তরের পশ্চিম-দিগন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে। এইক্ষণে ধরামণ্ডলের অর্দ্ধ ভূ-খণ্ড শ্রান্তি ও সুপ্তির ক্রোড়ে নিশ্চেতন, দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল প্রশান্ত হইয়াছে, প্রকৃতি ধ্যান-মগ্না তপস্বিনীর ন্যায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমাসীনা; এই সেই

পবিত্র সময়, যে সময়ে আমরা সংসার-কোলাহলের ক্ষণিক অবকাশের মধ্যে মনঃকর্ণে শুনিতে পাই, তাঁহার নিত্য-নিঃশ্বসিত উদাত্ত ওঁকার-ধ্বনি গগন-মণ্ডলের ব্রহ্ম-রন্ধ্র ভেদ করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে অনাদি কাল হইতে অন্তহীন কাল পর্য্যন্ত শাশ্বত আনন্দের পরিপূর্ণ গম্ভীর-স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে ; এই সেই সময়, যে সময় আমরা ধ্যানচক্ষে দেখিতে পাই,

"যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি"

সেই পূর্ণ পুরুষের পরম মঙ্গল-মূর্ত্তি সমস্ত অগণ্য গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" রূপে বিরাজ করিতেছে; এই সেই সময়, যখন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে থাকি, তাঁহার অপরিসীম শান্তি জননীর অঞ্চলের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তীর্ণ হইয়া সমস্ত-লোককে অভয়-বক্ষের সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই শান্তি আমাদের দুঃখ শোকের উপার ও নিদ্রার ন্যায় ও মৃত্যুর নিস্তব্ধতার উপরে রাত্রির ন্যায় স্নেহাবনত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

দিবসে সূর্য্যের আলোক আমাদের চক্ষের সম্মুখে এক সুবিশাল যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া রাখে, সেই আলোকে কেবল এই ক্ষুদ্র পৃথিবী বৃহৎ হইয়া আমাদের চক্ষে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে, অনন্তলোক অন্তরালে পড়িয়া যায় ; তখন আমাদের ক্ষুদ্র সংসার সমস্ত জগৎ ব্যাপারকে দিবালোকের বহির্ভাগে দূরীকৃত করিয়া রাখে, এবং জগতে কেবল আমাদের কর্তৃত্বই আড়ম্বরের সহিত সমুত্থান করে ; তখন ভ্রম হয়, আমরা এই পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ; অবশেষে সন্ধ্যার শ্রান্তি যখন আমাদের মাংসপেশীকে শিথিল এবং স্নায়ুজালকে অবসন্ন করিয়া আনে, যখন রাত্রির অন্ধকার নিঃশব্দে ও অনায়াসে আমাদের সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে, যখন অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-মালা তিমির-রাশির পর-প্রান্তে অনন্ত লোকের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র বিস্তার করিয়া দেয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি, দিবসে যে পৃথিবী আমাদের কাছে একমাত্র জগৎ হইয়া উঠিয়াছিল, সে এই বিশ্বজগতের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ; বুঝিতে পারি—দিবসে যে আমি সর্ব্বময় কর্ত্তা, সে এক্ষণে অন্ধ—শ্রান্ত—সুপ্ত, শিশুর ন্যায় নিঃসহায়; কেবল একমাত্র 'রক্ষকং রক্ষকাণাং' নির্ম্মিমেষ-নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া বিশ্বলোকে অবস্থান করিতেছেন।

এক্ষণে রজনীর মহান্ অন্ধকার দিবসের ক্ষুদ্র আলোক-যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিয়াছে ; এক্ষণে দেখিতেছি,

"দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।"

একাকী তুমিই দ্যুলোক-ভূলোক-মধ্য ও দিক্‌পুঞ্জ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ,

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"

তুমিই আদিদেব পুরাণ পুরুষ, তুমিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিধান, হে অনন্তরূপ! তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞেয় ও পরম-ধাম, তুমিই বিশ্বভুবন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ।

বালক যেমন দিবসে ক্রীড়ার সময় মাতার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকে, আবার সন্ধ্যা সমাগত হইলে, ক্রীড়া কৌতুক পরিহার করিয়া জননীর ক্রোড়েই আশ্রয় গ্রহণ করে, আমরা সেইরূপ দিবসে অনেক সময় সংসার-ক্রীড়ার ব্যস্ততায় তোমাকে

বিস্মৃত হইয়া থাকি, কিন্তু তুমি যে পরম স্নেহময়ী জননীরূপে বিশ্ব-জগতের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অহরহ আমাদের অজস্র মঙ্গল বিধান করিতেছ, হে বিশ্বজননি! তোমার সেই পরম-মঙ্গল সুমধুর-মাতৃ-ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইবার ইহাই আমাদের মাহেন্দ্র ক্ষণ।

আমরা অদ্য শুভ-লগ্নে এই নির্জ্জন-প্রান্তরের প্রান্তদেশে এই পবিত্র শান্তিনিকেতনাশ্রমে সমাগত হইয়াছি; তুমি আমাদের অদ্যকার এই রজনীর উৎসবকে সার্থক কর। এই বিপুল জন-সমাগমের মধ্যে সফলতা প্রেরণ কর! তোমার 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং আনন্দরূপং' এই দীপালোকিত মন্দির হইতে ঐ তারালোকিত গগন-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হউক।

অনাদ্যনন্তং করুণৈকসিন্ধুম্,
পরং মহান্তং ভুবনৈকবন্ধুম্।
বিভুং শিবানন্দকরং পরেশম্,
নমামি তং শান্তিনিকেতনেশম্ ॥ ১ ॥
সর্ব্বার্থদং সর্ব্বগুণাব্ধিমাত্মম্,
মোক্ষ-প্রদং সর্ব্বশুভৈকবীজম্।
বিশ্বার্চ্চিতং বিশ্বজনৈকনাথম্,
নমামি তং শান্তিনিকেতনেশম্ ॥ ২ ॥
সর্ব্বেশ্বরং শান্তিকরং বরেণ্যম্,
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং শরণ্যম্।
সত্যামৃতং প্রেমময়ং মহেশম্,
নমামি তং শান্তিনিকেতনেশম্ ॥ ৩ ॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এই প্রার্থনা করিলেন।

"ব্রহ্মোৎসব রূপ শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর আমরা আজি তার মধু সুখে পান করিতেছি। আজি অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র কে হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে বলিল, "বৎসগণ অগ্রে আজি আমাকে দেখ; আজি যে তোমাদের উৎসব, আমি তোমাদের উৎসবে আজি সমস্ত দিন আবির্ভূত থাকিব"। তাঁরই কৃপায় সেই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর আনন্দময় রূপ দেখিলাম। জ্ঞানচক্ষুঃ তৃপ্ত হইল। চর্ম্মচক্ষেও এক নবতর আলো আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই আলোকের কি অলৌকিক মোহিনী শক্তি—কি ঐন্দ্রজালিক গুণ! এইত সূর্য্য নক্ষত্র ভূষিত নীলাকাশ, হরিদ্বর্ণরঞ্জিত দূর্ব্বাদল-শোভিত প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রতিদিনই দেখি, কৈ আজিকার মত সুন্দর ত তাহাদিগকে কখন দেখি নাই।

কে তাহাদিগকে এ সুন্দর সাজে সাজাইল, যিনি আমাদের চক্ষুকে আজি নব নব শক্তিতে সম্পন্ন করিয়াছেন, তিনিই কি আজি প্রকৃতিকে তাঁহার নিজের চক্ষের আলোতে আলোকিত, ও সৌন্দর্য্যে সজ্জিত করেন নাই? এ সব সৌন্দর্য্য—সব শোভা তাঁরই। আজি পশু পক্ষীদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, তাহারাও বুঝি উৎসবের আনন্দভাগী হইতেছে। কপোতদিগকে আজি মাঠে সূর্য্যকিরণে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মনে হইল, তাহারাও উৎসব উপলক্ষে যেন নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে। বিহঙ্গমদিগের মধুর ধ্বনিতে আজি কার মধুর স্বর শুনিয়াছি? এ কি সেই মধুময়ের মধুর স্বর নয়? যাহা ভক্তিকর্ণ বিনা শ্রুতিগোচর হয় না। ফুলে আজি তাঁরই গন্ধ, রসনায় তাঁরই রস, ত্বকে তাঁরই স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেছি। তিনি যেন আজি সমস্ত শরীর ও আত্মায় বিশেষ রূপে

আবির্ভূত হইয়াছেন। কত যে তাঁর করুণা! কি বলিব বচন নাহি বলিবার! সে যে বাক্যাতীত করুণা! কি ক্ষুদ্র কীট আমরা আর কি মহান তিনি! কি পাপ-মলিনতা-পূর্ণ আমরা, আর কি পবিত্রতা-পূর্ণ তিনি! তথাপি আমরা অযোগ্য হইলেও, তিনি আমাদিগকে দর্শন দিয়া ও আপনাকে ভোগ করিতে দিয়া করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাণ এখন উদাস! আমরা উদাস প্রাণে বলিতেছি

"কি সুধাময় শোভা হেরিলাম,
হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে।
ধন্য দরশন লাভ হোলোরে,
ধন্য তোমার করুণা।"

আমরা দুর্ব্বল জীব, এমন করিয়া তোমায় সব দিন দেখিতে পাই না।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে প্রাণে,
তোমায় দেখিতে দেয় না॥
আঁখির পলকে যবে পাই দেখিতে,
সদা হারাই হারাই মনে হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ!
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে॥"

আমরা তোমার দর্শনের প্রার্থী। অনুক্ষণ কেমন করিয়া তোমায় হৃদয়ে রাখিব, হৃদয়ে দেখিব, তাহাই ভাবিতেছি। সংসার যেরূপ স্থান, তাহাতে সকল সময়ে এখানে তোমার হস্ত ধারণ করিয়া না থাকিলে, তোমায় চক্ষে চক্ষে না রাখিলে, তোমার কথা না শুনিতে পাইলে, তোমার ইঙ্গিত বুঝিয়া না চলিলে, ঘোর বিপদ, পদে পদেই বিপদ। আমাদের জ্ঞান নিতান্তই পরিমিত। আমরা সকল সময়ে সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারি না। এই জন্য অনেক সময়ে সংকট হইতে সংকটে পতিত হই।

পূর্ব্বকালের ঋষিরা তোমার নিকট সতত শুভবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেন; আমরাও আজি তোমার নিকট শুভবুদ্ধি, প্রার্থনা করিতেছি, যদ্দারা নিশ্চয়ই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হইবে।

আমরা আজি সম্পূর্ণ রূপে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমি আত্মা-রথে রথী হইয়া ইহাকে সৎপথে ধর্ম্মের পথে তোমার প্রেমের পথে লইয়া চল। আমরা আপনার বলে কিছুই করিতে পারি না।

"আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,
একমাত্র ভরসা করুণা তোমার।"

যখন আমরা তোমার অননুমোদিত পথে মোহ বা ভ্রমবশতঃ পদার্পণ করিতে উদ্যত হইব, তখনই তুমি ভিতর হইতে বলিও, "না" "ও পথে নয়"। ভাল করিয়া বলিও, বজ্রনিনাদে বলিও যেন বেশ করিয়া বুঝিতে পারি। স্বাধীনতা দিয়াছ বলিয়া, তখন আমাদিগকে ছাড়িয়া দিও না। তুমি পশ্চাতে না থাকিলে, স্বাধীনতা এখানে আমাদের ঘোর বিভ্রাট ঘটাইয়া দেয়। পুনর্ব্বার বলি—ব্যাকুলতার সহিত বলি, তুমি হৃদয় ও বুদ্ধিতে সতত আবির্ভূত থাকিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য বিষয়ে পরিচালিত করিও। কি ক্ষুদ্র আমরা, আমাদিগের বুদ্ধি হৃদয় স্বাধীনতা তোমার হস্তে না রাখিলে, আমরা একবারেই অন্ধ হইয়া যাই। পথ দেখিতে পাই না।

"অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণাসিন্ধু, কর করুণা-কণা দান"॥

এই আজি তোমার নিকট প্রার্থনা। এই হৃদয়-সিংহাসন তুমি স্বহস্তে রচিত করিয়াছ, নাথ! কেন না তবে তুমি সেখানে চিরস্থায়ী হইবে? কেন বিদ্যুতের ন্যায় কখন কখন সেখানে প্রকাশিত হইয়া লুকায়িত হও।

আমরা তোমার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া থাকি। তুমি আমাদের প্রার্থনা বাক্যে সায় না দিলে, আমাদের মনে হয়, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ। তখন কি নিদারুণ যন্ত্রণাই অনুভব করি। সকল অবস্থাতেই আমাদের তোমার নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। তুমি মনের কথা বুঝিয়া আমাদের সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিও। তাহা হইলেই এ লোকে তোমাকে অনেক দেখা হইল। আমরা তোমার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিলে বড় ভীত হই। সে মূর্ত্তি তুমি আমাদিগকে দেখাইও না। কেন দেখাইবে? যখন তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তখন আর যেন দুঃখ তাপ না পাই। আমরা আবদার করিয়া তোমার নিকট আজি একটি বিশেষ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ কর। আমরা তোমার প্রেমরূপের নিতান্ত পক্ষপাতী। ঐ রূপ সর্ব্বক্ষণ দেখিতে বড় ভালবাসি। তুমি ঐ রূপে অনুক্ষণ আমাদের হৃদয়ে বিরাজ কর।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই প্রেম-রূপ দেখিতে হইলে, নিরুদ্বেগ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। হে দেব! আমরা যেন কাহাকেও উদ্বেগ না দিই এবং কাহা হইতেও উদ্বেগ প্রাপ্ত না হই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরুদ্বিগ্ন করিও।

অনাথ-নাথ! কবে সে অবস্থা আসিবে, যখন তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগে আমরা তোমার প্রেমমুখের দিকে চাহিয়া অবিরল প্রেমাশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিব। কবে নিশি দিন তোমার সঙ্গে কথা কহিতে শিখিব, কবে তোমার মনঃপ্রাণমুগ্ধকর অশব্দ-বাক্য শুনিয়া প্রেমমোহে মোহিত হইব। নাথ! তোমার বিরহে আমাদের সময়ে সময়ে কি দশা ঘটে, তাহা তুমি জান। সে অবস্থা যেন আর না ঘটে। তখন আহারে বিহারে শয়নে ও বন্ধুসমাগমে কিছুতেই সুখ-শান্তি থাকে না। কখন কখন এ অবস্থায় আমরা মৃতপ্রায় হই। বোধ হইতে থাকে এক অনন্ত অন্ধকাররাশিতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে এ কঠিন যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিও। তুমি আমাদিগকে তোমার অমৃতময় মিলনের সুখে সুখী করিও। তোমাকে বক্ষে বক্ষে, চক্ষে চক্ষে রাখিতে পারিলে, সকল ভয় সকল শোক দূর হয়। তুমি অক্ষয় কবচ। তোমাতে হৃদয় আচ্ছাদিত থাকিলে, সংসারের চতুর্দ্দিক হইতে যে বিষাক্ত বাণ আসিতেছে, তাহা কিছুই করিতে পারে না। তুমি যদি হৃদয়-সরোবরে পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত থাক, তাহা হইলে কি সুখের অভাব থাকে? সে সুখ সামান্য সুখ নহে, সে ব্রহ্মানন্দরূপ জ্যোৎস্নায় আমাদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দাও। ব্রহ্মানন্দরূপ রস পান করিতে দিয়া আমাদিগকে দেবতাদিগের ন্যায় আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান কর। এ রসনায় যেন দিনরাত্রি ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে পারি। হৃদয়-তন্ত্রীতে তোমার শিব-নাম যেন মধুর শব্দে নিরন্তর বাজিতে থাকে। আমরা তোমার—তুমি আমাদের, এই মন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আমরা যেন প্রেমে তন্ময় হইয়া

তোমাতে ডুবিয়া যাই। সমস্ত জীবন যেন এই প্রকার তোমার অমৃতময় প্রেমময় হ্রদে ভাসিতে থাকি। তোমার অভয়চরণে নির্ভর করিয়া যখন আমরা ইহলোক পরিত্যাগ করিব, সেই একটি দিন। তখন তুমি মাতৃরূপে আমাদিগকে দর্শন দিও। সে গভীর অন্ধকারে এমন একটি স্নেহের আলো সম্মুখে ধরিও, যাহাতে ভয়ের লেশ মাত্র আমাদের নিকট না আসিতে পারে। তুমি বক্ষে করিয়া আমাদিগকে তোমার আনন্দ ও অমৃতধামে লইয়া যাইও, কালের নিশ্বাসে যেখানে আনন্দের কুসুম মলিন বিবর্ণ ও মৃত হইয়া যায় না। না জানি কি সুখময় স্থান সেই যেখানে পাপ নাই—পাপের যন্ত্রণা নাই, যেখানে বিবাদ নাই, বিদ্বেষ নাই, বিরহ নাই। কেবলি ভালবাসা, কেবলি ভক্তি, কেবলি প্রেম, কেবলই আনন্দ উদ্ভাসিত হইতেছে। যেখানে প্রেমের জ্যোতি কোন কালেই অস্তমিত হয় না। যেখানে দেবগণ সুস্পষ্ট রূপে তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, কি এক প্রেমের গানে আত্মহারা হইয়া তোমাকে গাইতেছেন—তোমার প্রেমের গান গাইয়া আকাশকে মধুময় অমৃতময় করিয়া তুলিতেছেন। যে খানে নিয়তই তুমি তাঁহাদের নয়নের তারা ও হৃদয়ের আলো হইয়া রহিয়াছ। হে দেব! তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপের কণামাত্র জ্যোতি আমাদের জ্ঞানচক্ষে বিশ্বাস চক্ষে আজি এমন করিয়া দেও, যাহাতে তোমার সেই আনন্দধামের হিরন্ময় জ্যোতি এ লোকে থাকিয়াই দেখিতে পাই। এই নাথ, তোমার নিকট আমাদের আজি প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর মঠাধ্যক্ষ স্বামীজী দাঁড়াইয়া বেদমন্ত্রে একটী প্রার্থনা করিলে সুমধুর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। পরে সমস্ত নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটচটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব পর্ব্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহা কোলাহলে স্ফুর্ত্তিত হইয়া উঠিল। তৎকালে খধুপোদ্গত গোলকের বিচিত্র নির্ম্মল আলোকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলই মস্তকরাজি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কি ভীষণ জনতা! কি বিষম কলরব! সর্ব্বশেষে একটা তোরণে আলোকরচিত 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই কথাটী পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া নির্ব্বিঘ্নে বহ্ন্যুৎসব পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল। এবারকার তীর্থযাত্রা সর্ব্বাবয়বে সকলের প্রীতিকর হইয়াছিল। বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে সকলেই বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন! কাহারই কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ক্লেশ হয় নাই।

সংবাদ।

আমরা ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি পাথুরেঘাটানিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহুকাল হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম অধ্যক্ষ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ছিলেন। ইহাঁর প্রাচীন রীতিক্রমে লিখিত সরল পদ্য সহৃদয় মাত্রেরই প্রীতিকর হইত। শ্রীমন্মহর্ষি দেব নাম-সাদৃশ্যে ইহাঁকে সখা বাবু বলিয়া আহ্বান করিতেন। ইনি একজন বিদ্বান ধার্ম্মিক মিষ্টভাষী ও অতিশিষ্ট স্বভাব ছিলেন। যিনি ইহাঁর সহিত একবার মাত্র আলাপ করিয়াছেন তিনিই

ইহাঁর হৃদয়ের মধুরতায় মোহিত হইয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি এখন যথায় গিয়াছেন তথায় পরম সুখ ও শান্তিতে অবস্থান করুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১১০১৸৯
পূর্ব্বকারস্থিত	...	২৭৮৩৸৵৬
সমষ্টি	...	৩৮৮৫॥৶৩
ব্যয়	..	১৭৯৩॥৵৩
স্থিত	...	২০৯২ ⁄০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲	
ঐ উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	১০০০৲	
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেভিং পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৶৩	
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত	৯১৬॥৶৯	
	১৫৫৪৸৵০	
		২০৫৪৸৵০
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু		৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত		৩০৶০
		২০৯২/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১০২৯॥৶৯

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	৩৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রয়	৯১৬॥৶৯
	১০২৯॥৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২।০

৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
„ „ শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, আন্দুল	৪॥০
„ „ গণেশপ্রসাদ লালা, রাজ দ্বারভাঙ্গা	৩।৵০
অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকা এক খণ্ড নগদ বিক্রয়	।৵০
	১২।০

পুস্তকালয়	...	৮॥০
যন্ত্রালয়	...	৫০৸/০
গচ্ছিত	...	॥০
সমষ্টি		১১০১৸৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৬২/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫।৶০
পুস্তকালয়	...	২০।৶৯
যন্ত্রালয়	...	৮৫॥৵০
সমষ্টি		১৭৯৩॥৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫৫ সংখ্যা

১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

অষ্টষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ রবিবার, প্রাতঃকাল।

রক্তাভ সূর্য্য উদিত হইয়াছে, সুশীতল মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে এই সময়ে সকলে ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য দলে দলে সমাগত হইতে লাগিলেন। সকলে আনন্দে উৎফুল্ল, বর্ষোৎসবে প্রাণ ভরিয়া প্রাণের প্রাণকে ডাকিবার জন্য উন্মুখ, এই অবসরে সুমধুর বন্দনা গান হইল। পরে ভক্তি-ভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শিবধন বিদ্যার্ণবকে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে সকলকে এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

"আজ কিসের এত উৎসব আয়োজন। কেন আজ শতকণ্ঠে পবিত্র বেদগান ধ্বনিত হইতেছে। কোন্ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আজ সকলে ব্যাকুল? বহু শতাব্দী পরে কে আবার বৈদিক সিদ্ধ মন্ত্রকে জাগাইয়া তুলিল? আমরা কি বাস্তবিকই বিপদের সম্মুখীন? এই অকাল বোধনে আর্য্যকুলদেবতার সিংহাসন সত্য সত্যই কি টলিয়া উঠিবে? আমরা উচ্চ কলরবে কেনই বা সকলের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি?

আজ মাঘের একাদশ দিবস। আটষট্টি বৎসর অতীত হইতে চলিল, আজিকার শুভদিনে আরণ্যক ঋষিদিগের অরণ্যের ধন—তাঁহাদের সাধন-তপস্যা-লব্ধ অক্ষয় সম্পত্তি সজন নগরে আনীত হইয়াছে; ভারতের সেই পুরাতন গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, তাই আমাদের এই আনন্দ কোলাহল! একমেবাদ্বিতীয়ং অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা, আত্মার মধ্যে পরমাত্মার সন্দর্শন, নিরবচ্ছিন্ন প্রীতিভক্তিযোগে তাঁহার উপাসনা পদ্ধতি, যাহা বিলুপ্ত স্মৃতির ন্যায় এদেশ হইতে এককালে তিরোহিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে সেই সুখস্বপ্ন অদ্যকার দিনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাই আমাদের আনন্দ-সরোবর উচ্ছ্বসিত! কোথায় আমরা অগণ্য দেবতার পশ্চাতে থাকিয়া বিবিধ বিধানে তাঁহাদের পূজার্চ্চনায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদ উপ-

নিষদের পত্র হইতে সেই এক ঈশ্বরের সন্ধান বলিয়াদিলেন; তাই আমাদের এত উদ্যম! ইতিহাসের অতীততম যুগের সহিত—সেই অতি প্রাচীন পূর্ব্ব-পিতৃপিতামহগণের সহিত, আমরা মমতার যে দুশ্ছেদ্য কোমল সূত্রে গ্রথিত, সিদ্ধ বেদমন্ত্রে আমাদের ব্রহ্মোপাসনাই, উহার অন্যতম নিদর্শন। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতী দৃষদ্বতী-তটে তাঁহারা সংস্কৃত পূতমন্ত্রে ঈশ্বরের মহিমা গান করিতেন, সেই দেবভাষা—মৃতভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি যখন আমরা "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করি, "অসতোমা সদ্গময়" বলিয়া কাতর হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, আমরা যে এতই হীন, এতই নির্জ্জীব, আমাদের মধ্যেও প্রাচীন ঋষিগণের সেই ব্রহ্মানুভূতি—সেই অতুল বৈরাগ্য—সেই দুর্দ্দম্য তেজ, বিদ্যুৎগতিতে ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়া আইসে।

আমাদের অধঃপতনের আর কি অবশিষ্ট আছে। অন্তঃসার ত বহুদিন বিলুপ্ত, রহিয়াছে তাহার ছায়া। যদি চৈতন্যই থাকিত, তবে প্রতীকার-চেষ্টা আপনা হইতেই আসিত। বলিতে কি, বিজাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা আসিয়া যদি এ দেশে সবেগে একটা আঘাত না করিত, তবে যাহাও কিছু দেখিতেছ, তাহারও বুঝি নিদর্শন মিলিত না। এ অবস্থায় ঈশ্বরই এই বিপদ-সমুদ্রের একমাত্র কাণ্ডারী, তাঁহার অমোঘ সাহায্যই আমাদের সর্ব্বস্ব। তাই আমরা তাঁহার করুণার ভিখারী হইয়া অকাল-বোধনে বরাভয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি; এবং সকলকে জাগ্রত করিয়া তাঁহার পদাশ্রয়লাভের জন্য মিনতি করিতেছি।

যদি কেহ বলেন, এদেশের পুরাণতন্ত্র সকলই ত বেদানুগ, তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যুক্তি তর্ক ও বেদ উপনিষদের উপরে, ব্রাহ্মসমাজের এত নিষ্ঠা কেন? সংক্ষেপে তাহার উত্তর এই যে, পুণ্যসলিলা গঙ্গা হিমালয় হইতে বিনির্গতা হইয়া সাগরাভিমুখী হইলে তাহা নানা শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। স্থানভেদে উহার মধ্যে কোনটা বা পূতিগন্ধ, কোনটা বা লবণাক্ত, কোনটা বা বালুকাবহুল, অথচ মূলে তৎসমস্তই ভাগীরথীর সেই নির্ম্মল সলিল। কাল ও অধিকারভেদে পুরাণ ও তন্ত্রের অবস্থা ঠিক ঐরূপ। উহাদের মধ্যে এতই জটিলতা আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে যে পুনরুত্থানকারীগণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও কষ্টকল্পনা ধর্ম্মের সেই প্রকৃতি-সুলভ সহজ সুন্দরভাব আনিয়া দিতে অক্ষম। একেই ত একতাবিহীন ভারতের অদৃষ্টবশে এক বেদ হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ সহস্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া দেশের ঘোর দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে! তাই আমরা সর্ব্ববিধ অকল্যাণ নিরাকরণের জন্য—বিগতবিবাদ ঈশ্বরকে লাভ করিবার আশয়ে, সকলধর্ম্মের মূলীভূত যুক্তিমূলক বেদ উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের দিন স্মরণ করিয়া আজ আমরা সেই বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমারাধ্য পরমদেবতার পূজার্চনার জন্য সকলে মিলিত হইয়াছি। তাঁহার সত্ত্বা আজ এখানে সকলে জাগ্রত জীবন্তরূপে অনুভব কর। ঐ যে তরুণ অরুণের রক্তচ্ছটা দেখিতেছ, উহা তাঁহারই সৌন্দর্য্যের ছায়া, প্রাভাতিক বায়ুহিল্লোলে তাঁহারই পবিত্র ভাব বিকীরিত, সমাগত সাধুসজ্জনের মুখশ্রীতে তাঁহারই আনন্দকণা

দেদীপ্যমান, নিখিলভুবন তাঁহারই সত্বাতে পরিপূর্ণ।

যদি গতি মুক্তির ভিখারী হইয়া বিপথে পদচারণা করিয়া থাক, কর-যোড়ে আজ তাঁহার শরণাপন্ন হও তিনি তোমাকে সুপথে পরিচালিত করিবেন। যদি আত্মার ক্রন্দন নীরবে সহ্য করিতে না পারিয়া ম্রিয়মান হইয়া থাক, আজ তাঁহার নিকটে সঞ্জীবন-সুধা ভিক্ষা কর। যদি পাপে কলঙ্কিত হইয়া আপনাকে শোধনের অতীত জানিয়া হতাশ হইয়া থাক, তথাপি ভয় নাই, তিনি নিজহস্তে তোমার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। ঈশ্বরের হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে গিয়া যদি সংসারের প্রতিকূল তরঙ্গে বিক্ষোভিত হইয়া থাক, আজ তাঁহার চরণ-তরী আশ্রয় কর, তিনি তোমাকে অভয়কূলে স্থান দিবেন। যদি বিষয়-সেবাতে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাক, আজ শান্তপ্রাণে সেই অজেয় দৈব বাণী শ্রবণ কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল প্রকম্পিত করিয়া বলিতেছে "জাগিতে হবে রে, মোহনিদ্রা কভু না রবে চির দিন"। যদি বিদ্যাবুদ্ধির প্রাখর্য্যে জগৎকে তুচ্ছ ভাবিয়া থাক, গত কল্য রাহুগ্রস্ত জ্যোতিষ্মান প্রখর সূর্য্যের ত পরিণাম দেখিলে! সেদিনকার ভীষণ ভূমিকম্পে পৃথিবীর স্থৈর্য্য ত বুঝিলে! তোমার এই সপ্তবিতস্তি পরিমিত দেহের উপর—তাহার বিদ্যাবুদ্ধির উপর আবার আস্থা কি? "প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে সন্ধান আসে ফিরে তিনি হে অকিঞ্চনগুরু।" কাতর প্রাণে দীন ভাবে আজ তাঁহার চরণের দিকে অগ্রসর হও। হৃদয়ের সদ্য-প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম রাশিরাশি তাঁহার চরণে অর্পণ কর, শিক্ষা দীক্ষা তাঁহারই হস্তে লাভ করিয়া ভক্তিযোগে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, নয়নের অশ্রু দিয়া তাঁহার চরণতল বিধৌত কর, জীবনধন সকলই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া আজ অক্ষয় অনন্ত ফল লাভ কর"।

অনন্তর স্বাধ্যায়যুক্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমৎ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই উপদেশ দিলেন।

"সর্ব্বমঙ্গলালয় পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই কিন্তু দুইই যাহাতে যথাকালে বিকসিত হইয়া পৃথিবীর মুখশ্রী সমুজ্জ্বল করিতে পারে এবং আত্মাকে পুণ্যজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ করিতে পারে তাহার জন্য তিনি নানা প্রকার দেশোপযোগী এবং কালোপযোগী বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—সে সকল বিধিব্যবস্থা সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল নিয়মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমাদের এই দীনাশ্রুসিক্ত বঙ্গভূমিতে এক্ষণে শত শত বিদ্যালয় বিষয়-জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে আমাদের বৈষয়িক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে কিন্তু প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উন্নতি—যাহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয় সেরূপ জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি—এক্ষণকার কোনো বিদ্যালয় হইতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমরা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, একদিকে যেমন আমাদের দেশে বিষয়-জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিতেছে আর এক দিকে তেমনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি নিতান্তই প্রার্থনীয়। কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বর যদি আমাদের প্রার্থনার পূর্ব্বেই আমাদের ভাবি প্রয়োজন

জানিয়া আমাদের মধ্যে সমুন্নত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ না করিতেন তাহা হইলে প্রকৃষ্ট জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তঃকরণে কেবল আকাঙ্ক্ষা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইত, তাহার চরিতার্থতার কোনো উপায়ই আমরা দেখিতে পাইতাম না। উন্নত বিজ্ঞানের এবং বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে উন্নত জ্ঞান-ধর্ম্মের শিক্ষা না পাইলে বালকদিগের কোমল অন্তঃকরণ যাহা অমৃতের খনি তাহা ক্রমে ক্রমে কিরূপ বিষের আকর হইয়া উঠে এবং তাহাদের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে কুপ্রবৃত্তি এবং স্বার্থ কিরূপ উদ্দাম হইয়া উঠিয়া পৃথিবীকে নরাকৃতি ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের আবাস করিয়া তুলে তাহা আমরা কঠোর পরীক্ষাতে চারিদিকে দেখিতেছি—দেখিতেছি যে, মনুষ্য গুরুজনের প্রতি ভক্তিহীন—ভ্রাতৃগণের প্রতি মমতা-বিহীন—আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিরক্ত এবং জন্মভূমির প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র জন্তুর ন্যায় সংসারারণ্যে দিবানিশি ভ্রাম্যমান হইতেছে; কিছুতেই তাহার দুষ্ট ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি মানিতেছে না। ইহা দেখিয়া এখনো কি আমাদের চেতন হইতেছে না!—স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ঈশ্বর-প্রেরিত এ বিষয়ে এখনো কি আমাদের মনে সন্দেহ পোষণ করিবার স্থান আছে? দুঃখ দুর্দিনের নিশীথ-সময়ে যখন আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের বামে নিবিড় অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতেছে—দক্ষিণে শ্মশানভূমিতে ভূতপ্রেত পিশাচ নৃত্য করিতেছে, সম্মুখে একটি সুনিভৃত পরিষ্কার পথ প্রসারিত রহিয়াছে, তখনও কি আমরা সেই সম্মুখের বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করিতে ইতস্তত করিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম যদিও পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি তাহা পুস্তকের ধর্ম্ম নহে—যদিও তাহা সম্প্রদায়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছে তথাপি তাহা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে—ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার জীবন-স্বরূপ। ধর্ম্ম যদিও মনুষ্যের আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি, তথাপি তাহাকে রীতিমত পরিস্ফুট করিতে হইলে শিক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সে শিক্ষা বিদ্যালয়-সুলভ বিজ্ঞান-শিক্ষা নহে। কেবল মাত্র বিজ্ঞান এবং বিষয়-জ্ঞানের শিক্ষাতে যতই ঐকান্তিক ভাবে লিপ্ত থাকা যায়, ততই জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যোগ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু বিজ্ঞানই যে জ্ঞানের সর্ব্বস্ব তাহা নহে। বিজ্ঞান কেবল জগতের বহিঃপরিচ্ছদের সন্নিধানবর্ত্তী কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাতে ব্যাপৃত হয়; তাহার ভিতরে যে আধ্যাত্মিক রাজ্য রহিয়াছে—বিজ্ঞান সেখানে কিছুতেই নাগাল পায় না। কেবল জগতের উপরি-স্তরের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা অবগত হইয়া মনুষ্যের জ্ঞান কখনই তৃপ্ত হইতে পারে না। মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি—তাহাই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রধান জিজ্ঞাসা। মনুষ্যই জগতের চরম অভিব্যক্তি; এই জন্য, যাহা মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য তাহাই সমুদায় সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য এবং তাহাই সমস্ত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার মূল প্রবর্ত্তক। সে চরম উদ্দেশ্য কি? নশ্বর বিষয় সম্বন্ধীয় আপাতদর্শী জ্ঞান এবং কলুষিত অনুরাগের চরিতার্থতা নহে—অবিনাশী পরমাত্মা সম্বন্ধীয় অন্তর্দর্শী জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ প্রেমের চরিতার্থতাই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই এক হস্তে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর এক হস্তে ব্রহ্মোপাসনা ধারণ করিয়া আমা-

দের নিদ্রিত আত্মাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উত্থান কর জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। যিনি আমাদের প্রসুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করিবার জন্য—তাপিত হৃদয়কে শীতল করিবার জন্য—মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিবার জন্য অষ্টষষ্টিবৎসর পূর্ব্বে মাঘের একাদশ দিবসে আমাদের মধ্যে পরম পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়া শুষ্কতরু মুঞ্জরিত করিয়াছেন এবং মরুভূমিতে উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, সেই পরমপিতা পরমমাতা এবং চিরন্তন সুহৃদের চরণে আজ আমরা সবান্ধবে মিলিয়া বার বার ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদির নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন।

"অন্তরের অন্তর, ডাকি তোমায়; ডাকি তোমায়, প্রাণদাতা; রাখ রাখ আমায়।

দুস্তর ভবার্ণবে তুমি ভেলা, অন্ধকার জগতের তুমি আলো।"

নাথ! আজি উৎসবের দিনে—আনন্দের দিনে—এই পবিত্র সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি আমরা ভক্তিপূর্ব্বক তোমার চরণে অর্পণ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর আমরা চরিতার্থ হই। এ অন্ধকারময় সংসারে কার মুখজ্যোতি আজি এখানে প্রকটিত হইয়াছে? আমরা কি আজি তোমারি মুখের স্নিগ্ধ আলোকে শরীর মন আত্মাকে শীতল করিতেছি না? যাহার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, যাহার আত্মা তোমার চরণ-সরোজে সংলগ্ন আছে, সেই জানিতেছে, তোমার এই আলোকস্পর্শ কি সুখাবহ! তোমাকে বক্ষে করিয়া কি আনন্দ-সুধা এখন পান করিতেছি তাহা কে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়? এই আনন্দই ঋষিদিগের সর্ব্বস্ব ছিল। সংসারাসক্তি পরিহার পূর্ব্বক কি আনন্দ-সুধাই তাঁহারা পান করিতেন। তপোবনে যে স্বর্গের ছায়া পড়িয়াছিল, সে কেবল তাঁহাদের ব্রহ্মানন্দের গুণে। আমরা, নাথ! আজি তোমার সেই আনন্দের প্রার্থী। তোমায় ছাড়িয়া এ সংসারে যে আনন্দ আছে, তাহা আনন্দ নামের যোগ্যই নহে। আমরা স্বার্থবিহীনা মাতার স্নেহ পাইয়াও তোমার বিশেষ স্নেহের আকাঙ্ক্ষা রাখি। পতিব্রতার প্রেম পাইয়াও তোমার প্রীতির জন্য লালায়িত হই। বন্ধুর অকৃত্রিম প্রণয় পাইয়াও তোমাকে সখারূপে অনুভব না করিলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। এখানকার ভাল জিনিসও যাহা আছে, তাহাও অপূর্ণ। তাহারাও সকল সময়ে সকল অবস্থাতে প্রাণে শান্তি দিতে পারে না। দয়াময়! তুমি আমাদের মোহ-আবরণ—মায়ার বন্ধন খুলিয়া দাও। স্থান দাও তোমার চরণ কমলে "কাতর যোদেরি প্রাণ, সংসারে, ওগো পিতা দাও তব চরণে স্থান"। আমরা সংসাররূপ ফুলে মধুপান করিতে গিয়া কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, রুধিরধারায় স্নাত হইয়াছি। তুমি কোথায়, মঙ্গল হস্তে তাহা মুছাইয়া দাও। কত হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রহিয়াছে কে তাহার ভেষজ হইয়া তাহা দূর করিবে? কত সময়ে আমাদের চক্ষু দিয়া শোকাশ্রু বহে, তুমি বিনা কে তাহা আর মার্জ্জনা করিয়া দিবে? কত সময়ে কত কঠিন কথা শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হই—তুমি বিনা কে সে মর্ম্মপীড়া

নিবারণ করিবে? এসংসারে যাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া জানি, তাহারাও পর হয়, অতএব তুমি যে আমাদের আপনার হইতেও আপনার তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেও। তুমি বিবেক ও বৈরাগ্য দাও। সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া তোমার প্রেমের পথে আকর্ষণ কর। "নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দেও, মাঝে কিছু রেখোনা, রেখোনা, থেকোনা দূরে। নির্জ্জনে সজনে, অন্তরে বাহিরে, নিত্য তোমারে হেরিব।" এই তোমার নিকট ভিক্ষা। কেমন করিয়া তোমায় দেখিব, কেমন করিয়া তোমার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিব আমরা ভাবিয়াই আকুল, অথচ তোমাকে না পাইলেও এসংসারে প্রাণ বাঁচে না! জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, কোন শক্তি নাই—তথাপি বামনের চন্দ্র ধরিবার ন্যায় প্রাণ তোমাকে পাইবার জন্য আকুল, জানি না কি উপায়ে তুমি আমাদের আশা পূর্ণ করিবে। হে দেব! অন্ধকার এ সংসার তুমি বিনা। তুমি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে পবিত্রতার জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও। তোমার তুলনা রহিত আনন্দের মধ্যে আনিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। এই আমাদের তোমার নিকট প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

সায়ংকাল।

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটী আলোকমালায় মণ্ডিত। সমস্ত স্থান লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। পরে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব 'ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি' এই বেদমন্ত্রে শান্তিপাঠ করিলেন।

পরে এই বেদগান হইল।

"এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তাঅহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরাইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সব্রাহ্মণঃ।

ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বতসকল হইতে স্যন্দমান হইতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মই অভয় ব্রহ্মই অভয়।"

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইরূপ বক্তৃতা করিলেন।

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আবার আমাদের মাঘোৎসব উপস্থিত। যে বৎসর অতিবাহিত হয়েছে তার ঘটনাবলি আমাদের আশাপ্রদ নয়—এর মধ্যে কত শোক তাপ কত দুঃখ বিপত্তি আমাদের উপর দিয়ে গিয়েছে তার অন্ত নেই—

রাজার প্রতি প্রজাবিদ্রোহ, প্রজার প্রতি রাজবিদ্বেষ—

ভৌতিক উপদ্রব—অন্নকষ্ট—দুর্ভিক্ষ—মড়ক—ঝঞ্ঝার উৎপাত—ভূমিকম্প—

এই সকল অতিক্রম করিয়া আমরা এই উৎসবের দিনে পদার্পণ করেছি।—

যাঁরা এই উৎসবের আলোক জনকোলাহল সাজসজ্জা প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরে বিমুগ্ধ তাঁরা এর যথার্থ মাহাত্ম্য, প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত নন।—

আজ আধ্যাত্মিক জগতে মনোনিবেশ কর। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর—সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং—তাঁর সিংহাসন সমক্ষে আমাদের হিসাব দেখাবার দিন এই।—

কিরূপ হিসাব?—

আত্মার উন্নতি কতদূর সাধন করেছি—

ধর্ম্মবল উপার্জন—আত্ম-সংযমন—স্বার্থত্যাগ—পরোপকার ব্রতপালন—দেশের হিতসাধন—এতে কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি।

মহাত্মা রামমোহন রায় এই বঙ্গভূমিতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করে গিয়েছেন—যার প্রসাদে আমরা উপধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করেছি—উপদেবতা পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারী হয়েছি, সে ধর্ম্ম কতদূর রক্ষণ ও পোষণে সক্ষম হয়েছি—শুধু মুখে নয় কিন্তু জীবন ও চরিত্রে—বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এই বীজ কত দূর বিক্ষিপ্ত করতে পেরেছি, সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা উপধর্ম্ম কতদূর পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছি—

এই হিসেব নিয়ে সেই দেবদেবের নিকট আমরা উপনীত—

এই সকল প্রশ্নের ভাল মন্দ উত্তরের উপর আমাদের ভাবি মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করছে।

এর যদি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি তা হলেই আমাদের মঙ্গল—তবেই ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে কৃতার্থ হব।

আর যদি দেখি এর কোন সন্তোষজনক উত্তর নাই, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই সাধিত হয়নি, পাপপ্রবৃত্তি আমাদের উপর জয় লাভ করেছে, মন্দ অভ্যাসে আত্মা এরূপ জড়িত হয়েছে যে তার হস্ত থেকে নিস্তার নেই, —পাপ তাপ শোকে বিষাদে জীর্ণ শীর্ণ

মুহ্যমান হয়ে রয়েছি তা হলে এ উৎসবের কি উপকারিতা, কি ফল? তাহলে এ উৎসবে আমাদের কোন অধিকার নাই, এ আমাদের পক্ষে কেবল নিরর্থক বাহ্য আড়ম্বর মাত্র।

দেখ আমাদের কি অধিকার!

যিনি সর্ব্বস্ব প্রভুমীশানং—যাঁর অঙ্গুলীর এক ইঙ্গিতে কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র আকাশপথে ভ্রাম্যমান, যে সূর্য্য আমাদের উত্তাপ, আলোক, জীবন প্রবাহের মূল, যার প্রকাশ ছুমিনিট কাল গত হলে জগতে প্রলয়দশা উপস্থিত হয় (তার নিদর্শন আমরা কাল সূর্য্যগ্রহণের সময় কতকটা পেয়েছি) সেই সূর্য্য যাঁর আদেশে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে উদয় হয়ে আমাদের এই পৃথিবীতে আলোক উত্তাপ বর্ণ সৌন্দর্য্য বিতরণ করছে—তাঁরই পূজার জন্য আমরা আজ তাঁর সিংহাসন সমক্ষে সমাগত।

আমরা কি সাহসে, কোন্ পুণ্যবলে তাঁর কাছে যাই—পদে পদে যাঁর আদেশ অবহেলা করেছি—যাঁর নিয়ম লঙ্ঘন করেছি।

এই মলিন পঙ্কিল হৃদয় নিয়ে কি সাহসে সেই তেজোময় মিহিরের সমক্ষে দণ্ডায়মান হই!

আমরা অতি ক্ষুদ্র, সেই অনন্ত স্বরূপের এক দিক মাত্র দেখতে পাই—এক একটি কিরণ কণা আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।—কোন কোন ধর্ম্মে সেই অনন্ত স্বরূপের কর্তৃত্ব—তাঁর প্রভুত্ব—রাজপ্রতাপ এই ভাবটি বিশেষ রূপে পরিস্ফুটিত, যেমন মুসলমান ধর্ম্মে।—

আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে—

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ—একটু প্রণিধান করে দেখুন এতে জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি শুধু আমার রাজা নন—প্রভু নন—তিনি আমার সুহৃৎ।—

রাজদ্বারে উপস্থিত হলে আমাদের মনে ভয় হতে পারে—কিন্তু যখন তাঁকে আমার সখা বলে আলিঙ্গন দিতে পারি তখন ত তাঁর নিকটে যাওয়া দুঃসাধ্য বোধ হয় না। তিনি সখা, বন্ধুর নিকটে মনোবেদনা জানান ত কিছুই কঠিন নয়—তিনি আমার সখা—সমদুঃখসুখী, আমার উন্নতিসাধনে তিনি যত্নবান্—কিসে আমরা বিপদ সঙ্কট হতে উদ্ধার হতে পারি তার জন্য তিনি সমুৎসুক—তিনি আমার সুহৃৎ অতএব আমরা তাঁর শরণ ভিক্ষার অধিকারী।

আমরা যে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি তাতে আমাদের কি অবস্থা একবার পর্য্যালোচনা করে দেখ, বুঝতে পারবে তাঁর আশ্রয়ের প্রয়োজন কি না।

"এখানে নাহি কি পাপতাপ আছে যে
সুখেতে শয়ান"—

দেখ চারিদিকে কি জীবন সংগ্রাম কলহ!

প্রথমে, প্রকৃতিকে জয় করতে হবে নতুবা প্রকৃতি আমাদের উপর জয়লাভ করবে।

দাবানলে দেশ দগ্ধ হবে—জলপ্লাবনে গ্রাম পল্লী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—ভূমিকম্পে সব ছারখার করে দেবে।

মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থা থেকে এই প্রকৃতির সংগ্রাম চলছে—ক্রমে আমরা জল বায়ু অগ্নির উপর আধিপত্য স্থাপন করেছি—ওষধি বনস্পতির গুণাগুণ পরীক্ষা করে আপনার কাজে এনেছি—ভূগর্ভ খনন করে রত্নোদ্ধার কচ্চি।

সমুদ্র, যার তরঙ্গরাজি দেখলেও ভয় হয়, তার উপর দিয়ে অনায়াসে গতিবিধি করছি; এমন সহজে এমন নির্ব্বিঘ্নে যে

আমাদের নিজ নিজ গ্রামে নিজ গৃহেও সেরূপ নয়; কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রকৃতির সকল শক্তির উপর আমাদের অধিকার নেই।

এক বৎসর বৃষ্টির অভাবে আমাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের হাহারব উপস্থিত হয়—এমন কি আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীর যার সংরক্ষণের জন্য আমরা এত কচ্চি তার উপরেও আমাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই,আমরা এত ঔষধি প্রস্তুত করচি শারীরতত্ত্বের আলোচনা করচি তবুও ব্যাধির হস্ত এড়াতে পারি না।—

এই সংগ্রাম নিয়তই চলেছে।

প্রকৃতির কথা যাক্, মনুষ্যসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—দেখবে কতপ্রকার সামাজিক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়।

যাঁরা সমাজসংস্কার বিষয়ে আলোচনা করছেন—সেই সংস্কারকার্য্যে যত্নবান্—তাঁরা দেখছেন আমাদের সামাজিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, জনসমাজের হিতসাধন উদ্দেশে—কত প্রকার অনিষ্টকর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করবার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির অধীনতা, শিক্ষার অভাব।—একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পারেন স্ত্রীজাতির উন্নতিতেই বাস্তবিক আমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করছে। অন্তঃপুরে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করতে হবে। মাতা যদি জ্ঞান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন তার সুফল পরিবার মধ্যে আপনা হতেই ফলিত হয়। আর মাতা যদি অশিক্ষিত কুসংস্কারপূর্ণ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকেন তার কুফল সমস্ত পরিবার মধ্যে বিস্তৃত হবে। আমাদের অঙ্গ পক্ষাঘাতে আহত হলে যেমন সর্ব্বশরীর বিকলতা প্রাপ্ত হয়—স্ত্রীজাতির হীনাবস্থায় আমাদের সমাজেরও সেইরূপ দুর্গতি। স্ত্রী পুরুষ মিলেই ত সমাজ।

তার পর জাতিভেদের নিয়ম দেখ—এই কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের স্বাধীনতার লোপাপত্তি হয়েছে—আমরা 'ছিন্নভিন্ন হীনবল' এই সন্ধি পেয়ে শত্রুদল সহজেই আমাদের পরাস্ত করলে, আমরা শত্রুহস্তে পতিত হয়ে নিজের মস্তক নিজ খড়্গাঘাতেই ছেদন করলুম। যে সময়ে এই জাতিভেদের নিয়ম হিন্দুসমাজে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় হয়ত এ প্রথা তখনকার সময়ের উপযোগী ছিল কিন্তু ক্রমে সে আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আমাদের প্রভূত অনিষ্ট উৎপাদন করেছে। এই নিয়মে জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে মনুষ্যে মনুষ্যে পার্থক্য স্থাপিত হয়ে আমাদের পরস্পর হতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেচে, সমাজের এক সম্প্রদায় মনে করছেন—আমিই বড় আর সকলে আমা অপেক্ষা নীচু, তাহাদের আমরা ঘৃণাভাবে কৃপাচক্ষে দেখি, তাদের ছায়া মাড়ালেও পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—এ অপেক্ষা আমাদের জাতীয় দুর্গতি কি হতে পারে? একটু প্রণিধান করে দেখলে দেখতে পারেন এই নিয়মই আমাদের জাতীয় অধীনতা—জাতীয় অবনতির মূল। কেবল উদার ধর্ম্মবলে ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা এ ভাব কতকটা দমন করতে পারি—মনুষ্যজন্মের যে এক মর্য্যাদা আছে তা অনুভব করিতে পারি। আমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের সমান অধিকারী—রোগ শোক মৃত্যুর সমভাগী—তবে কেন আমি আমার ভ্রাতাকে হীনচক্ষে দেখি? আমরা উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে এই সত্যটি শিক্ষা করেছি—ঈশ্বর আমাদের পিতা আমরা তাঁ-

হার পুত্র, এই সত্যটি সার জেনে সকল ভ্রাতাকে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দে বন্ধন ও আলিঙ্গন কর।

আবার দেখ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের সমাজের কি হীনাবস্থা।—

এককালে ভারতবর্ষে যে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ক্রমেই তার হীনাবস্থা হয়েছে—কালক্রমে আমরা কি অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছি—আমাদের ধর্ম্ম কতকগুলি আচার মাত্র—মালাজপা, মন্ত্রপাঠ, তীর্থযাত্রা ও যাগযজ্ঞ এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম।

এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্মসাধনের সহজ উপায়—আমি শুনেছি চীন জাতির মধ্যে একটী প্রথা আছে যিনি পাপ হতে নিষ্কৃতি লাভ ইচ্ছা করেন তিনি নিজ পাপের একটী তালিকা লিখে পুরোহিতের হাতে দেন,আর পুরোহিত সেইটি অগ্নিসাৎ করে ভস্ম করে ফেলেন—পাপী মনে করে আমার সকল পাপ বিনষ্ট হল।

তেমনি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রার্থনা-চক্র। চাকা ঘুরিয়ে দিলুম আর মনে করলুম ঈশ্বরপ্রার্থনার যথেষ্ট ফললাভ হল।

আমাদেরও সেইরূপ। আমরা এই সকল সহজ অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মসাধন মনে করি। আর আসল যা ধর্ম্ম তা কষ্টসাধ্য, আমরা সেদিক্ দিয়ে যাইনে।

আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, কুপ্রবৃত্তি দমন, সত্যপালন, লোকোপকার-ব্রতধারণ, যা আসল ধর্ম্ম তার পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, ওসব ছেড়েদিয়ে আমরা সহজসাধ্য ধর্ম্মপথ অবলম্বন করি—গঙ্গাস্নান করে মনে করি কত পুণ্যই উপার্জ্জন করলুম! আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে ঈশ্বর যে আদেশ প্রেরণ করছেন তার প্রতি আমরা বধির, আর কতকগুলি শাস্ত্রের বচন আমরা শিরোধার্য্য করে মানি। ধর্ম্মবুদ্ধির মন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান করে পরবাক্যের উপর নির্ভর করে চলি; এই নিয়ম অনুসারে আমরা নিরাকার নির্ব্বিকার পুরুষের ধ্যান ধারণা হতে নিরস্ত হয়ে আপন হস্তে পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করে, অনন্ত পুরুষকে সীমাবদ্ধ করে তাঁর পূজা করি। এই ধনপ্রাণ সৌন্দর্য্যময় জগতে কি জগৎপতির পরিচয় নেই, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা গিরিগুহা কানন সেই সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী পরমেশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করে না যে এইরূপ বিকৃত কল্পনা ভিন্ন আমাদের গতি নেই? আমরা অসীমকে এইরূপে সীমাবদ্ধ করে আপনার সমকক্ষে নামিয়ে এনেছি—সত্যের উপর অসত্যের ছায়া আরোপ করেছি, স্বর্গকে পৃথিবীর ধূলির মধ্যে নামিয়ে এনে আপনাকে পুণ্যবান ও কৃতার্থ মনে করছি—আমাদের সমাজকে এই সকল দুর্গতি হতে উদ্ধার করতে হবে।

যাক্! সমাজ থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মার প্রতি দৃষ্টি কর।

প্রথমে দেখ অদৃষ্টের সঙ্গে আমাদের কিরূপ যুদ্ধ চলছে। কেহ ধনী,কেহ দরিদ্র, কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থ সবল হয়ে জন্মেছেন। দারিদ্র্য দুঃখের সহিত দরিদ্রের কি ঘোরতর সংগ্রাম করতে হয়! এমন কত শত লোক আছে যারা এক সন্ধ্যা আহার করে দিনপাত করছে, যাদের ঘরে পরদিনের অন্ন সংস্থান নাই, যাদের পরিশ্রমের ফল অন্যেরা ভোগ করছে, মহাজনের নিকট যারা ধন প্রাণে বাঁধা।

হে ধনবান সুখী লোক সকল—কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে! এই সকল দুঃখী ভ্রাতাদের কষ্টের প্রতি একবার দৃক্‌পাত কর—সে কষ্ট অনুভব করলে তোমাদের ভোগস্পৃহা কি তেমনিই বলবতী

থাকবে? না তাদের সমদুঃখে অশ্রুপাত করে সাধ্যমত সাহায্য দানে তাদের কষ্ট-দূর করতে তৎপর হবে।

হে দরিদ্র! তুমি মনে করছ তোমার সধন প্রতিবাসীর কেমন সুখের অবস্থা, সে অবস্থা দেখে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক সে কি সুখী, তার কি কোন কষ্ট নেই? সমাজের যে যত উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় তার উপর তত গুরুভার, তার তেমনি গুরুতর কর্ত্তব্য, তার উপর কতলোকের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে। দারিদ্র্যের একরূপ কষ্ট ধনীর ভাগ্যেও নানা দুঃখ কষ্ট বিপত্তি। আমরা প্রতি-জনেই এই অদৃষ্টচক্রে ঘূর্ণিত হয়ে যোঝাযুঝি করছি। এইত গেল অদৃষ্ট।

তারপর নিজ নিজ অভ্যাস। আমরা অভ্যাসের কিরূপ দাস! অবস্থা আমা-দের বহিঃপরিচ্ছদ মাত্র, অভ্যাসই আমা-দের শরীর। অভ্যাস সমষ্টিতেই আমাদের স্বভাব বিরচিত। যেমন সদভ্যাস গুণে আমরা সহজে সৎপথে ধর্ম্মের পথে প্রধা-বিত হই, তেমনি মন্দ অভ্যাসের ফলে আমরা অধোগতি প্রাপ্ত হই। মন্দ অভ্যাস গুলিকে বিসর্জ্জন না দিলে আমা-দের মঙ্গল নাই—

কেহ আলস্যের দাস
কেহ লোভ-পরবশ
কেহ পানাসক্ত।

কতবার প্রতিজ্ঞা করছি এ অভ্যাস ত্যাগ করব সে প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হচ্ছে—আ-মাদের শরীর মন ক্ষয় হচ্ছে—মস্তিষ্ক হীনবল হচ্ছে—আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে ঈশ্বরের নিকট হতে অশেষ শাস্তি ভোগ করছি তথাপি আমাদের চেতনা হয় না, আমরা অভ্যাসের দাস হয়ে অপথে পরি-ভ্রমণ করি, অভ্যাস স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাড়তে পারি না।

এখন বহির্দ্দেশ হতে আরো অন্তরে প্রবেশ কর দেখতে পাবে আমরা প্রবৃত্তি-স্রোতে কিরূপ নীয়মান হই।

ইন্দ্রিয় সকল নানা দিকে ধাবিত হয়ে আমাদিগকে নানা দিকে আকর্ষণ করছে।

চক্ষু অস্থানে দৃষ্টিপাত করতে তৎপর।

কর্ণ পরনিন্দা শ্রবণের জন্য ব্যস্ত।

রসনা যে রসাস্বাদনের জন্য লালায়িত তা অতীব কটুরস, আপাতরমণীয় বটে কিন্তু পর্য্যন্তপরিতাপী।

উদর অতিমাত্র পানভোজনে উৎ-পীড়িত।

হস্ত পরদ্রব্য অপহরণের জন্য প্রসারিত। এই জীবন সংগ্রামে আমরা ব্যাপৃত—আ-মাদের কি সেই চিরসুহৃদের সাহায্যের প্রয়োজন নাই?

আমাদের কি এতই বল, এমনি প্র-তাপ যে তাঁর সাহায্য বিনা এই ঘোরতর সংসার যুদ্ধে আত্মবলে আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম, একথা যে কোন কার্য্যেরই নয় আমরা তা প্রত্যেকেই নিজে নিজে বুঝতে পারছি।

সেই সখাই আমাদের জীবনের এক-মাত্র আধার, আশ্রয়স্থান।

তিনিই ধর্ম্মের আবহ পাপের পরি-ত্রাতা। তিনি আমাদের প্রতিজনের হৃদয়ে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করছেন, সেই আদেশ শুনে চললে নিশ্চয়ই আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারি!

সাধু যার ইচ্ছা ঈশ্বর তার সহায়; আ-মাদের সাধু চেষ্টায় ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় তিনিই উৎসাহদাতা, অতএব হে ভ্রাতৃগণ! তাঁর শরণাপন্ন হও।

এখন তাঁর নিকট যাবার উপায় কি?